BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

প্রোফেসর শঙ্কু

প্রোফেসর শঙ্কু কে ? তিনি এখন কোথায় ? এটুকু জানা গেছে যে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক।

কেউ কেউ বলে যে তিনি নাকি একটা ভীষণ পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শোনা যায় যে তিনি কোনও অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলেই আত্মপ্রকাশ করবেন।

প্রোফেসর শঙ্কুর প্রত্যেকটি ডায়রিতে কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। কাহিনীগুলি সত্য কি মিথ্যা, সম্ভব কি অসম্ভব, সে বিচার পাঠকেরা করবেন।

ব্যোমযাত্রীর ডায়রি

প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর ডায়রিটা আমি পাই তারক চাটুজ্যের কাছ থেকে।

একদিন দুপুরের দিকে আপিসে বসে পুজো সংখ্যার জন্য একটা লেখার প্রুফ দেখছি, এমন সময় তারকবাবু এসে একটা লাল খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো। গোল্ড মাইন।'

তারকবাবু এর আগেও কয়েকবার গল্পটল্প এনেছিলেন। খুব যে ভাল তা নয়; তবে বাবাকে চিনতেন, আর ছেঁড়া জামাটামা দেখে মনে হত, ভদ্রলোক বেশ গরিব; তাই প্রতিবারই লেখাগুলোর জন্য পাঁচ-দশ টাকা করে দিয়েছি।

এবারে গল্পের বদলে ডায়রিটা দেখে একটু আশ্চর্য হলাম।

প্রোফেসর শঙ্কু বছর পনেরো নিরুদ্দেশ। কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি কী একটা ভীষণ এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শুনেছি যে তিনি নাকি জীবিত; ভারতবর্ষের কোনও অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলে আত্মপ্রকাশ করবেন। এ-সব সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে এটা জানতাম যে তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর যে ডায়রি থাকতে পারে সেটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সে ডায়রি তারকবাবুর কাছে এল কী করে?

জিজ্ঞেস করতে তারকবাবু একটু হেসে হাত বাড়িয়ে আমার মশলার কৌটোটা থেকে লবঙ্গ আর ছোট এলাচ বেছে নিয়ে বললেন, 'সুন্দরবনের সে ব্যাপারটা মনে আছে তো?'

এই রে আবার বাঘের গল্প। তারকবাবু তাঁর সব ঘটনার মধ্যে বাঘ জিনিসটাকে যেভাবে টেনে আনেন সেটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কোন ব্যাপারটার কথা বলছেন?'

'উল্কাপাত! ব্যাপার তো একটাই।'

ঠিক ঠিক। মনে পড়েছে। এটা সত্যি ঘটনা। কাগজে বেরিয়েছিল। বছরখানেক আগে একটা উল্কাখণ্ড সুন্দরবনের মাথারিয়া অঞ্চলে এসে পড়েছিল। বেশ বড় পাথর। কলকাতার জাদুঘরে যেটা আছে তার প্রায় দ্বিগুণ। মনে আছে, কাগজে ছবি দেখে হঠাৎ একটা কালো মড়ার খুলি বলে মনে হয়েছিল।

বললাম, 'তার সঙ্গে এই খাতাটার কী সম্পর্ক?'

তারকবাবু বললেন, 'বলছি। ব্যস্ত হয়ো না। আমি গেসলাম ওই মওকায় যদি কিছু বাঘছাল জোটে। ভাল দর পাওয়া যায়, জান তো? আর ভাবলুম অত জন্তুজানোয়ার মোলো, তার মধ্যে কি গুটি চারেক বাঘও পড়ে থাকবে না? কিন্তু সে গুড়ে বালি। লেট হয়ে গেল। হরিণটরিণ কিচ্ছু নেই।'

'তা হলে?'

'ছিল কিছু গোসাপের ছাল। তাই নিয়ে এলুম। আর এই খাতাটা।'

একটু অবাক হয়ে বললাম, 'খাতাটা কি ওইখানে...?'

'গর্তের ঠিক মধ্যিখানে। পাথরটা পড়ায় একটা গর্ত হয়েছিল জান তো? তোমাদের

চারখানা হেদো তার মধ্যে ঢুকে যায়। এটা ছিল তার ঠিক মধ্যিখানে।'

'বলেন কী!'

'বোধহয় পাথরটা যেখানে পড়েছিল তার খুব কাছেই। লাল-লাল কী একটা মাটির ভেতর থেকে উঁকি মারছে দেখে টেনে তুললাম। তারপর খুলতেই শঙ্কুর নাম দেখে পকেটস্থ করলাম।'

'উল্কার গর্তের মধ্যে খাতা? তার মানে কি...?'

'পড়ে দেখো। সব জানতে পারবে। তোমরা তো বানিয়ে গল্পটল্প লেখো, আমিও লিখি। এ তার চেয়ে ঢের মজাদার। এ আমি হাতছাড়া করতাম না, বুঝলে! নেহাত বড় টানাটানি যাচ্ছে তাই—'

টাকা বেশি ছিল না কাছে। তা ছাড়া ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই কুড়িটা টাকা দিলাম ভদ্রলোককে। দেখলাম তাতেই খুশি হয়ে আমায় আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

তার পর পুজোর গোলমালে খাতাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই সেদিন আলমারি খুলে চলন্তিকাটা টেনে বার করতে গিয়ে ওটা বেরিয়ে পড়ল।

খাতাটা হাতে নিয়ে খুলে কেমন যেন খটকা লাগল।

যতদূর মনে পড়ে প্রথমবার দেখেছিলাম কালির রং ছিল সবুজ। আর আজ দেখছি লাল? এ কেমন হল?

খাতাটা পকেটে নিয়ে নিলাম। মানুষের তো ভুলও হয়। নিশ্চয়ই অন্য কোনও লেখার সবুজ কালির সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছি।

বাড়িতে এসে আবার খাতাটা খুলতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

এবার দেখি কালির রং নীল।

তারপর এক আশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে।

এবারে তো আর কোনও ভুল নেই; কালির রং সত্যি বদলাচ্ছে।

হাতের কাঁপুনিতে খাতাটা মাটিতে পড়ে গেল। আমার ভুলো কুকুরটা যা পায় তাতেই দাঁত বসায়। খাতাও বাদ গেল না। কিন্তু আশ্চর্য! যে দাঁত এই দু' দিন আগেই আমার নতুন তালতলার চটিটা ছিঁড়েছে, ওই খাতার কাগজ তার কামড়ে কিচ্ছু হল না।

হাত দিয়ে টেনে দেখলাম এ কাগজ ছেঁড়া মানুষের সাধ্যি নয়।

টানলে রবারের মতো বেড়ে যাচ্ছে, আর ছাড়লে যে-কে-সেই।

কী খেয়াল হল, একটা দেশলাই জ্বেলে কাগজটায় ধরালাম। পুড়ল না। খাতাটা পাঁচ ঘণ্টা উনুনের মধ্যে ফেলে রেখে দিলাম। কালির রং যেমন বদলাচ্ছিল, বদলাল, কিন্তু আর কিচ্ছু হল না।

সেই দিনই রাত্রে ঘুমটুম ভুলে গিয়ে তিনটে অবধি জেগে খাতাটা পড়া শেষ করলাম। যা পড়লাম তা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এ সব সত্যি কি মিথ্যে, সম্ভব কি অসম্ভব, তা তোমরা বুঝে নিও।

১লা জানুয়ারি

আজ দিনের শুরুতেই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল।

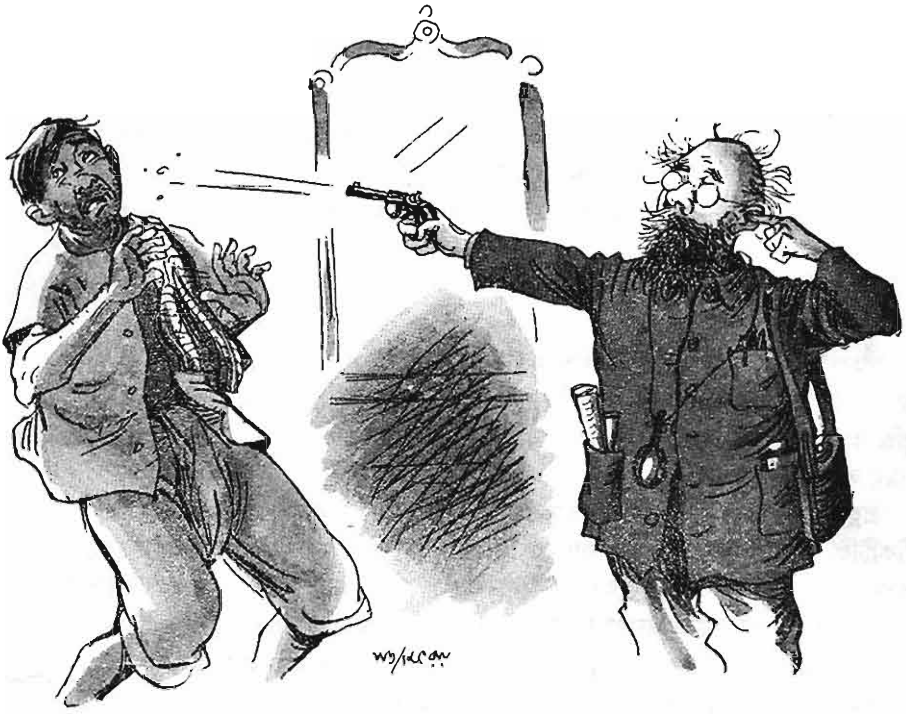

রোজকার মতো আজও নদীর ধারে মর্নিং ওয়াক সেরে ফেলেছি। শোবার ঘরে ঢুকতেই একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের সামনে পড়তে হল। চমকে গিয়ে চিৎকার করেই বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে আয়না, এবং লোকটা আর কেউ নয়—আমারই ছায়া। এ ক'বছরে আমারই চেহারা ওই রকম হয়েছে। আমার আয়নার প্রয়োজন হয় না বলে ওটার ওপর ক্যালেন্ডারটা টাঙিয়ে রেখেছিলাম ; আজ সকালেই বোধহয় প্রহ্লাদটা বছর শেষ হয়ে গেছে বলে সর্দারি করে ওটাকে নামিয়ে রেখেছে। ওকে নিয়ে আর পারা গেল না। সাতাশ বছর ধরে আমার সঙ্গে থেকে আমার কাজ করেও ওর বুদ্ধি হল না। আশ্চর্য !

চিৎকার শুনে প্রহ্লাদ ঘরে এসে পড়েছিল। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে করে আমার Snuff-gun বা নস্যাস্ত্রটা ওর ওপর পরীক্ষা করা গেল। দেখলাম, এ নস্যির যা তেজ, তাক করে গোঁফের কাছাকাছি মারতে পারলেই যথেষ্ট কাজ হয় ! এখন রাত এগারোটা। ওর হাঁচি এখনও থামেনি। আমার হিসেব যদি ঠিক হয় তো তেত্রিশ ঘণ্টার আগে ও হাঁচি থামবে না।

২রা জানুয়ারি

রকেটটা নিয়ে যে চিন্তাটা ছিল, ক্রমেই সেটা দূর হচ্ছে। যাবার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই মনে জোর পাচ্ছি, উৎসাহ পাচ্ছি।

এখন মনে হচ্ছে যে প্রথমবারের কেলেঙ্কারিটার জন্য একমাত্র প্রহ্লাদই দায়ী। ঘড়িটায় দম

দিতে গিয়ে সে যে ভুল করে কাঁটাটাই ঘুরিয়ে ফেলেছে তা আর জানব কী করে। এক সেকেন্ড এ দিক ও দিক হলেই এ সব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। আর কাঁটা ঘোরানোর ফলে আমার হয়ে গেল প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা লেট। রকেট যে খানিকটা উঠেই গোঁৎ খেয়ে পড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী ?

রকেট পড়ায় অবিনাশবাবুর মুলোর ক্ষেত নষ্ট হওয়ার দরুন ভদ্রলোক পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ চাইছেন। একেই বলে দিনে ডাকাতি। এ দিকে এত বড় একটা প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হতে চলেছিল তার জন্য কোনও আক্ষেপ বা সহানুভূতি নেই।

এই সব লোককে জব্দ করার জন্য একটা নতুন কোনও অস্ত্রের কথা ভাবা দরকার।

৫ই জানুয়ারি

প্রহ্লাদটা বোকা হলেও ওকে সঙ্গে নিলে হয়তো সুবিধে হবে। আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে এই ধরনের অভিযানে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরই প্রয়োজন। অনেক সময় যাদের বুদ্ধি কম হয় তাদের সাহস বেশি হয়, কারণ ভয় পাবার কারণটা ভেবে বের করতেও তাদের সময় লাগে।

প্রহ্লাদ যে সাহসী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সে বার যখন কড়িকাঠ থেকে একটা টিকটিকি আমার বাইকর্নিক অ্যাসিডের শিশিটার উপর পড়ে সেটাকে উলটে ফেলে দিল, তখন আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু করতে পারছিলাম না। স্পষ্ট দেখছি অ্যাসিডটা গড়িয়ে গড়িয়ে প্যারাডক্সাইট পাউডারের স্তূপটার দিকে চলেছে, কিন্তু দুটোর কনট্যাক্ট হলে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে তাই ভেবেই আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

এমন সময় প্রহ্লাদ ঢুকে কাণ্ডকারখানা দেখে এক গাল হেসে হাতের গামছাটা দিয়ে অ্যাসিডটা মুছে ফেলল। আর পাঁচ সেকেন্ড দেরি হলেই আমি, আমার ল্যাবরেটরি, বিধুশেখর, প্রহ্লাদ, টিকটিকি এ সব কিছুই থাকত না।

তাই ভাবছি হয়তো ওকে নেওয়াই ভাল। ওজনেও কুলিয়ে যাবে। প্রহ্লাদ হল দু' মন সাত সের, আমি এক মন এগারো সের, বিধুশেখর সাড়ে পাঁচ মন, আর জিনিসপত্তর সাজসরঞ্জাম মিলিয়ে মন পাঁচেক। আমার রকেটে কুড়ি মন পর্যন্ত জিনিস নির্ভয়ে নেওয়া চলতে পারে।

৬ই জানুয়ারি

আমার রকেটের পোশাকটার আস্তিনে কতগুলো উচ্চিংড়ে ঢুকেছিল, আজ সকালে সেগুলো ঝেড়েঝুড়ে বার করছি, এমন সময় অবিনাশবাবু এসে হাজির। বললেন, 'কী মশাই, আপনি তো চাঁদপুর না মঙ্গলপুর কোথায় চললেন। আমার টাকাটার কী হল ?'

এই হল অবিনাশবাবুর রসিকতার নমুনা। বিজ্ঞানের কথা উঠলেই ঠাট্টা আর ভাঁড়ামো। রকেটটা যখন প্রথম তৈরি করছি তখন একদিন এসে বললেন, 'আপনার ওই হাউইটা এই কালীপুজোর দিনে ছাড়ুন না। ছেলেরা বেশ আমোদ পাবে !'

এক-এক সময় মনে হয় যে পৃথিবীটা যে গোল, এবং সেটা যে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেটাও বোধহয় অবিনাশবাবু বিশ্বাস করেন না।

যাই হোক ; আজ আমি তাঁর ঠাট্টায় কান না দিয়ে বরং উলটে তাঁকে খুব খাতির টাতির করে বসতে বললাম। তারপর প্রহ্লাদকে বললাম চা আনতে। আমি জানতাম যে

অবিনাশবাবু চায়ে চিনির বদলে স্যাকারিন খান। আমি স্যাকারিনের বদলে ঠিক সেই রকমই দেখতে একটি বড়ি তাঁর চায়ে ফেলে দিলাম। এই বড়িই হল আমার নতুন অস্ত্র। মহাভারতের জৃম্ভণাস্ত্র থেকেই আইডিয়াটা এসেছিল, কিন্তু এটায় যে শুধু হাই উঠবে তা নয়। হাই-এর পর গভীর ঘুম হবে, এবং সেই ঘুমের মধ্যে সব অসম্ভব ভয়ঙ্কর রকমের স্বপ্ন দেখতে হবে।

আমি নিজে কাল চার ভাগের এক ভাগ বড়ি ডালিমের রসে ডাইলিউট করে খেয়ে দেখেছি। সকালে উঠে দেখি স্বপ্ন দেখে ভয়ের চোটে দাড়ির বাঁ দিকটা একেবারে পেকে গেছে।

৮ই জানুয়ারি

নিউটনকে সঙ্গে নেব। ক' দিন ধরেই আমার ল্যাবরেটরির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে এবং করুণস্বরে ম্যাও ম্যাও করছে। বোধহয় বুঝতে পারছিল যে আমার যাবার সময় হয়ে আসছে।

কাল ওকে Fish Pillটা খাওয়ালাম। মহা খুশি।

আজ মাছের মুড়ো আর বড়ি পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করে দেখলাম। ও বড়িটাই খেল। আর কোনও চিন্তা নেই! এবার চটপট ওর জন্য একটা পোশাক আর হেলমেট তৈরি করে ফেলতে হবে।

১০ই জানুয়ারি

দু' দিন থেকে দেখছি বিধুশেখর মাঝে মাঝে একটা গাঁ গাঁ শব্দ করছে। এটা খুবই আশ্চর্য, কারণ বিধুশেখরের তো শব্দ করার কথা নয়। কলকব্জার মানুষ কাজ করতে বললে চুপচাপ কাজ করবে ; এক নড়াচড়ার যা ঠং ঠং শব্দ। ও তো আমারই হাতের তৈরি, তাই আমি জানি ওর কতখানি ক্ষমতা। আমি জানি ওর নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি বলে কিছু থাকতেই পারে না। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করছি।

এক দিনের ঘটনা খুব বেশি করে মনে পড়ে।

আমি তখন সবে রকেটের পরিকল্পনাটা করছি। জিনিসটা যে কোনও সাধারণ ধাতু দিয়ে তৈরি হতে পারে না, সেটা প্রথমেই বুঝেছিলাম। অনেক এক্সপেরিমেন্ট করার পর, ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস আর কচ্ছপের ডিমের খোলা মিশিয়ে একটা কমপাউন্ড তৈরি করেছি, এবং বেশ বুঝতে পারছি যে এবার হয় ট্যানট্রাম বোরোপ্যাক্সিনেট, না-হয় একুইয়স্ ভেলোসিলিকা মেশালেই ঠিক জিনিসটা পেয়ে যাব।

প্রথমে ট্যানট্রামটাই দেখা যাক ভেবে এক চামচ ঢালতে যাব এমন সময়ে ঘরে একটা প্রচণ্ড ঘটাং ঘটাং শব্দ আরম্ভ হল। চমকে গিয়ে পিছন ফিরে দেখি বিধুশেখরের লোহার মাথাটা ভীষণভাবে এপাশ-ওপাশ হচ্ছে এবং তাতেই আওয়াজ হচ্ছে। খুব জোর দিয়ে বারণ করতে গেলে মানুষে যেভাবে মাথা নাড়ে ঠিক সেই রকম।

কী হয়েছে দেখতে যাব মনে করে ট্যানট্রামটা যেই হাত থেকে নামিয়েছি অমনি মাথা নাড়া থেমে গেল।

কাছে গিয়ে দেখি কোনও গোলমাল নেই। কলকব্জা তেলটেল সবই ঠিক আছে। টেবিলে ফিরে এসে আবার যেই ট্যানট্রামটা হাতে নিয়েছি অমনি আবার ঘটাং ঘটাং।

এ তো ভারী বিপদ ! বিধুশেখর কি সত্যিই বারণ করছে নাকি ?

এবার ভেলোসিলিকাটা হাতে নিলাম। নিতেই আবার সেই শব্দ। কিন্তু এবার মাথা নড়ছে উপর নীচে ঠিক যেমন করে মানুষে হ্যাঁ বলে।

শেষ পর্যন্ত ভেলোসিলিকা মিশিয়েই ধাতুটা তৈরি হল।

পরে ট্যানট্রামটা দিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। না করলেই ভাল ছিল। সেই চোখ-ধাঁধানো সবুজ আলো আর বিস্ফোরণের বিকট শব্দ কোনওদিন ভুলব না।

১১ই জানুয়ারি

আজ বিধুশেখরের কলকব্জা খুলে ওকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করেও ওর আওয়াজ করার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না। তবে এও ভেবে দেখলাম যে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি আগেও অনেকবার দেখেছি যে আমার বৈজ্ঞানিক বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে আমি যে জিনিস তৈরি করি, সেগুলো অনেক সময়েই আমার হিসেবের বেশি কাজ করে। তাতে এক এক সময় মনে হয়েছে যে হয়তো বা কোনও অদৃশ্য শক্তি আমার অজ্ঞাতে আমার উপর খোদকারি করছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? বরঞ্চ আমার মনে হয় যে আমার ক্ষমতার দৌড় যে ঠিক কতখানি তা হয়তো আমি নিজেই বুঝতে পারি না। খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের শুনেছি এ রকম হয়।

আর একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। সেটা হচ্ছে, বাইরের কোনও জগতের প্রতি আমার যেন একটা টান আছে, এই টানটা লিখে বোঝানো শক্ত। মাধ্যাকর্ষণের ঠিক উলটো কোনও শক্তি যদি কল্পনা করা যায়, তা হলে এটার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। মনে হয় যেন পৃথিবীর প্রভাব ছাড়িয়ে যদি কিছুদূর উপরে উঠতে পারি, তা হলেই এই টানটা আপনা থেকেই আমাকে অন্য কোনও গ্রহে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

এ টানটা যে চিরকাল ছিল তা নয়। একটা বিশেষ দিন থেকে এটা আমি অনুভব করে আসছি। সেই দিনটার কথা আজও বেশ মনে আছে।

বারো বছর আগে। আশ্বিন মাস। আমি আমার বাগানে একটা আরামকেদারায় শুয়ে শরৎকালের মৃদু মৃদু বাতাস উপভোগ করছি। আশ্বিন-কার্তিক মাসটা আমি রোজ রাত্রে খাবার পরে তিন ঘণ্টা এই ভাবে শুয়ে থাকি, কারণ এই দুটো মাসে উল্কাপাত হয় সবচেয়ে বেশি। এক ঘণ্টায় অন্তত আট-দশটা উল্কা রোজই দেখা যায়। আমার দেখতে ভারী ভাল লাগে।

সে দিন কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম খেয়াল নেই হঠাৎ একটা উল্কা দেখলাম যেন একটু অন্য রকম। সেটা ক্রমশ বড় হচ্ছে, এবং মনে হল যেন আমার দিকেই আসছে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। উল্কাটা ক্রমে ক্রমে কাছে এসে আবার বাগানের পশ্চিম দিকের গোলঞ্চ গাছটার পাশে থেমে একটা প্রকাণ্ড জোনাকির মতো জ্বলতে লাগল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য !

আমি উল্কাটাকে ভাল করে দেখব বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

এটাকে স্বপ্ন বলেই বিশ্বাস করতাম, কিন্তু দুটো কারণে খটকা রয়ে গেল। এক হল ওই আকর্ষণ, যেটার বশে আমি তার পরদিন থেকেই রকেটের বিষয় ভাবতে শুরু করি।

আরেক হল এই গোলঞ্চ গাছ। সেই দিন থেকেই গাছটাতে গোলঞ্চর বদলে একটা নতুন রকমের ফুল হচ্ছে। এ রকম ফুল কেউ কোথাও দেখেছে কি না জানি না। আঙুলের মতো পাঁচটা করে ঝোলা ঝোলা পাপড়ি। দিনেরবেলা কুচকুচে কালো কিন্তু রাত হলেই ফসফরাসের মতো জ্বলতে থাকে। আর যখন হাওয়ায় দোলে তখন ঠিক মনে হয় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

১২ই জানুয়ারি

কাল ভোর পাঁচটায় মঙ্গলযাত্রা।

আজ প্রহ্লাদকে ল্যাবরেটরিতে ডেকে এনে ওর পোশাক আর হেলমেটটা পরিয়ে

দেখলাম। ও তো হেসেই অস্থির। সত্যি কথা বলতে কী আমারও ওর চেহারা ও হাবভাব দেখে হাসি পাচ্ছিল। এমন সময় একটা ঠং ঠং ঘং ঘং শব্দ শুনে দেখি বিধুশেখর তার লোহার চেয়ারটায় বসে দুলছে আর গলা দিয়ে একটা নতুন রকম শব্দ করছে। এই শব্দের মানে একটাই হতে পারে। বিধুশেখরও প্রহ্লাদকে দেখে হাসছিল।

নিউটন হেলমেটটা পরানোর সময় একটু আপত্তি করেছিল। এখন দেখছি বেশ চুপচাপ আছে, আর মাঝে মাঝে জিভ বার করে হেলমেটের কাচটা চেটে চেটে দেখছে।

২১শে জানুয়ারি

আমরা সাত দিন হল পৃথিবী ছেড়েছি। এ বার যাত্রায় কোনও বাধা পড়েনি। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রওনা হয়েছি।

যাত্রী এবং মালপত্র নিয়ে ওজন হল পনেরো মন বত্রিশ সের তিন ছটাক। পাঁচ বছরের মতো রসদ আছে সঙ্গে। নিউটনের এক-একটা Fish Pill-এ সাত দিনের খাওয়া হয়ে যায়। আমার আর প্রহ্লাদের জন্য বটফলের রস থেকে যে বড়িটা তৈরি করেছিলাম—বটিকা-ইন্ডিকা—কেবল মাত্র সেইটাই নিয়েছি। বটিকা-ইন্ডিকার একটা হোমিওপ্যাথিক বড়ি খেলেই পুরো চব্বিশ ঘণ্টার জন্য খিদে তেষ্টা মিটে যায়। এক মন বড়ি সঙ্গে আছে।

নিউটনের এত ছোট জায়গায় বেশিক্ষণ বন্ধ থেকে অভ্যাস নেই তাই বোধ হয় প্রথম ক'দিন একটু ছটফট করেছিল। কাল থেকে দেখছি আমার টেবিলের উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরের দৃশ্য দেখছে। কুচকুচে কালো আকাশ, তার মধ্যে অগণিত জ্বলন্ত গ্রহনক্ষত্র। নিউটন দেখে আর মাঝে মাঝে আস্তে লেজের ডগাটা নাড়ে। ওর কাছে বোধ হয় ওগুলোকে অসংখ্য বেড়ালের চোখের মতো মনে হয়।

বিধুশেখরের কোনও কাজকর্ম নেই, চুপচাপ বসে থাকে। ওর মন বা অনুভূতি বলে যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা ওর গোল গোল বলের মতো নিষ্পলক কাচের চোখ দেখে বোঝবার কোনও উপায় নেই।

প্রহ্লাদের দেখছি বাইরের দৃশ্য সম্পর্কে কোনও কৌতূহলই নেই, ও বসে বসে কেবলমাত্র রামায়ণ পড়ে। ভাগ্যে বাংলাটা শিখেছিল আমার কাছে।

২৫শে জানুয়ারি

বিধুশেখরকে বাংলা শেখাচ্ছি। বেশ সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে, তবে চেষ্টা আছে। প্রহ্লাদ যে ওর উচ্চারণের ছিরি দেখে হাসে, সেটা ও মোটেই পছন্দ করে না। দু-একবার দেখেছি ও মুখ দিয়ে গঁ গঁ আওয়াজ করছে আর পা দুটো ঠং ঠং করে মাটিতে ঠুকছে। ওর লোহার হাতের একটা বাড়ি খেলে যে কী দশা হবে সেটা কি প্রহ্লাদ বোঝে না ?

আজ বিধুশেখরকে পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন লাগছে ?'

ও প্রশ্নটা শুনে দু-তিন সেকেন্ড চুপ করে থেকে হঠাৎ দুলতে আরম্ভ করল, কিছুক্ষণ সামনে পিছনে দুলে তারপর হাত দুটোকে পরস্পরের কাছে এনে ঠং ঠং করে তালির মতো বাজাল। দু-পায়ে খানিকটা সোজা হয়ে উঠে ঘাড়টাকে চিত করে বলল, 'গাগোঃ'।

ও যে আসলে বলতে চাচ্ছিল, 'ভাল' সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

আজ মঙ্গলগ্রহটাকে একটা বাতাবিলেবুর মতো দেখাচ্ছে। আমার হিসেব অনুযায়ী আরেক মাস পরে ওখানে পৌঁছব। এই ক' মাস নির্বিঘ্নে কেটেছে। প্রহ্লাদ রামায়ণ শেষ করে মহাভারত ধরেছে।

আজ সকালে দূরবিন দিয়ে গ্রহটাকে দেখছি এমন সময় খেয়াল হল বিধুশেখর কী জানি বিড়বিড় করছে। প্রথমে মন দিইনি, তারপর লক্ষ করলাম যে বেশ লম্বা একটা কথা বারবার বলছে। প্রতিবার একই কথা। আমি সেটা খাতায় নোট করে নিলাম, এই রকম দাঁড়াল।

'ঘঙো ঘাংঙ কুঁক্ক ঘঙা আগাঁকেকেই ককুং খঙা।'

লেখাটা পড়ে এবং ওর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম ও কী বলছে। কিছুদিন আগে দ্বিজু রায়ের একটা গান গুনগুন করে গাইছিলাম, এটা তারই প্রথম লাইন—'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'।

বিধুশেখরের উচ্চারণের প্রশংসা করতে না পারলেও ওর স্মরণশক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

জানালা দিয়ে এখন মঙ্গলগ্রহ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আস্তে আস্তে গ্রহের গায়ের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে আসছে। কাল এই সময়ে ল্যান্ড করব। অবিনাশবাবুর ঠাট্টার কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

আমাদের যে সমস্ত জিনিস সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি—ক্যামেরা, দূরবিন, অস্ত্রশস্ত্র, ফার্স্ট-এড বক্স, এ সবই নিতে হবে।

মঙ্গলগ্রহে যে প্রাণী আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তবে তারা যে কী রকম—ছোট কি বড়, হিংস্র না অহিংস—তা জানি না। একেবারে মানুষের মতো কিছু হবে সেটাও অসম্ভব বলে মনে হয়। যদি বিদ্‌ঘুটে কোনও প্রাণী হয় তা হলে প্রথমটা ভয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে আমরা যেমন তাদের কখনও দেখিনি, তারাও কখনও মানুষ দেখেনি।

প্রহ্লাদকে দেখলাম তার ভয়-ভাবনা নেই। সে দিব্যি নিশ্চিন্ত আছে। তার বিশ্বাস গ্রহের নাম যখন মঙ্গল তখন সেখানে কোনও অনিষ্ট হতেই পারে না। আমিও ওর সরল বিশ্বাসে—

তখন ডায়রি লিখতে লিখতে এক কাণ্ড হয়ে গেল। বিধুশেখরকে ক' দিন থেকেই একটু চুপচাপ দেখছিলাম, কেন তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এখনও প্রশ্ন করলে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। কেবল কোনও একটা কথা বললে সেটা শুনে নকল করার চেষ্টা করে।

আজ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী যে হল এক লাফে যন্ত্রপাতির বোর্ডটার কাছে উঠে গিয়ে যে হ্যান্ডেলটা টানলে রকেটটা উলটো দিকে যায় সেইটা ধরে প্রচণ্ড টান। আমরা তো ঝাঁকুনির চোটে সব কেবিনের মেঝেয় গড়াগড়ি।

কোনওমতে উঠে গিয়ে বিধুশেখরের কাঁধের বোতামটা টিপতেই ও বিকল হয়ে হাত-পা মুড়ে পড়ে গেল। তারপর হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে মোড় ফিরিয়ে আবার মঙ্গলের দিকে যাত্রা।

বিধুশেখরের এরকম পাগলামির কারণ কী? ওকে আপাতত অকেজো করেই রেখে দেব। ল্যান্ড করবার পর আবার বোতাম টিপে চালু করব। আমার বিশ্বাস ওর 'মনের' উপর চাপ পড়ছিল বেশি, বড্ড বেশি কথা বলা হয়েছে ওর সঙ্গে, তাই বোধহয় ওর 'মাথাটা' বিগড়ে গিয়েছিল।

আর পাঁচ ঘণ্টা আছে আমাদের ল্যান্ড করতে। গ্রহের গায়ে যে নীল জায়গাগুলো প্রথমে জল বলে মনে হয়েছিল, সেটা এখন অন্য কিছু বলে মনে হচ্ছে। সরু সরু লাল সুতোগুলো

www.BDeBooks.Com

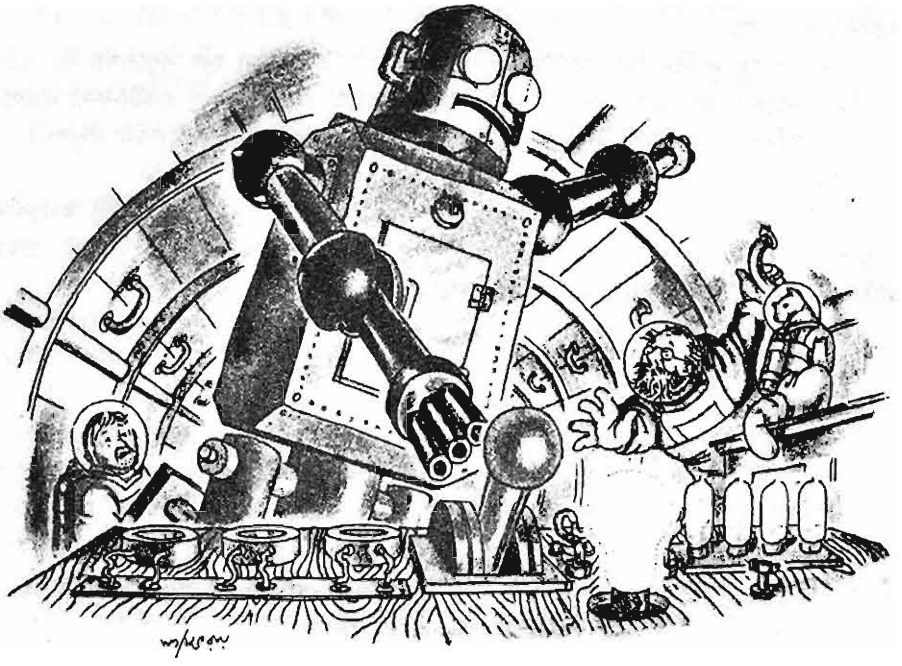

যে কী এখনও বুঝতে পারছি না।

আমরা দু' ঘণ্টা হল মঙ্গলগ্রহে নেমেছি। একটা হলদে রঙের নরম 'পাথরের' ঢিপির উপরে বসে আমি ডায়রি লিখছি। এখানে গাছপালা মাটি পাথর সবই কেমন জানি নরম রবারের মতো।

সামনেই হাত বিশেক দূরে একটা লাল নদী বয়ে যাচ্ছে। সেটাকে প্রথমে নদী বলে বুঝিনি কারণ 'জল'টা দেখলে ঠিক মনে হয় যেন স্বচ্ছ পেয়ারার জেলি। এখানে সব নদীই বোধহয় লাল। এবং সেগুলোকেই আকাশ থেকে লাল সুতোর মতো দেখায়। যেটাকে রকেট থেকে জল বলে মনে হয়েছিল সেটা আসলে ঘাস আর গাছপালা—সবই সবুজের বদলে নীল। আকাশের রং কিন্তু সবুজ, তাই সব কী রকম উলটো মনে হয়।

এখন পর্যন্ত কোনও প্রাণী চোখে পড়েনি। আমার হিসেব তা হলে ভুল হল নাকি? কোনও সাড়াশব্দও পাচ্ছি না? কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। এক নদীর জলের কুলকুল শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দই নেই; আশ্চর্য নিস্তব্ধ।

ঠাণ্ডা নেই; বরঞ্চ গরমের দিকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা হাওয়া আসে, সেটা ক্ষণস্থায়ী হলেও একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। দূরে হয়তো বরফের পাহাড় টাহাড় জাতীয় কিছু আছে।

নদীর জলটা প্রথমে পরীক্ষা করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তারপর নিউটনকে খেতে দেখে ভরসা পেলাম। আঁজলা করে তুলে চেখে দেখি অমৃত! মনে পড়ল একবার গারো পাহাড়ে একটা ঝরনার জল খেয়ে আশ্চর্য ভাল লেগেছিল। কিন্তু এর কাছে সে জল কিছুই

না। এক ঢোঁক খেয়েই শরীর ও মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

বিধুশেখরকে নিয়ে আজ এক ফ্যাসাদ। ওর যে কী হয়েছে জানি না। রকেট ল্যান্ড করার পর বোতাম টিপে ওকে চালু করে দিলাম, কিন্তু নড়েও না চড়েও না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে, তুমি নামবে না ?'

ও মাথা নেড়ে না বলল।

বললাম, 'কেন, কী হয়েছে ?'

এবার বিধুশেখর হাত দুটো মাথার উপর তুলে গম্ভীর ভয়-পাওয়া গলায় বলল, 'বিভং'।

বিধুশেখরের ভাষা বুঝতে আমার কোনও অসুবিধা হয় না। তাই বুঝলাম ও বলছে, 'বিপদ'। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বিপদ বিধুশেখর ? কীসের ভয় ?'

বিধুশেখর আবার গম্ভীর গলায় বলল, 'বিভং ভীবং বিভং'।

বিপদ ! ভীষণ বিপদ।

অগত্যা বিধুশেখরকে রকেটে রেখেই আমরা তিনটি প্রাণী মঙ্গলগ্রহের মাটিতে পদার্পণ করলাম।

প্রথম পরিচয়ের অবাক ভাবটা দু'ঘণ্টার মধ্যে অনেকটা কেটে গেছে। নতুন জগতের যে একটা গন্ধ থাকতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। রকেট থেকে নেমেই সেটা টের পেলাম। এটা গাছপালা জলমাটির গন্ধ নয়—কারণ আলাদা করে প্রত্যেকটা জিনিস শুঁকে দেখেছি। এটা মঙ্গলগ্রহেরই গন্ধ, আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে রয়েছে। হয়তো পৃথিবীরও একটা গন্ধ রয়েছে যেটা আমরা টের পাই না, কিন্তু অন্য কোনও গ্রহের লোক সেখানে গেলেই পাবে।

প্রহ্লাদ পাথর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে বলেছি কোনও প্রাণীটানি দেখলে আমায় খবর দিতে।

একদিকের আকাশে দেখছি সবুজ রঙে লালের ছোপ পড়েছে। এখন তা হলে বোধহয় ভোর, শিগগিরই সূর্য উঠবে।

মঙ্গল গ্রহের বিভীষিকা মন থেকে দূর হতে কত দিন লাগবে জানি না। কী করে যে প্রাণ নিয়ে বাঁচলাম সেটা ভাবতে এখনও অবাক লাগে। মঙ্গল যে কত অমঙ্গল হতে পারে, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

ঘটনাটা ঘটল প্রথম দিনেই !

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি টিলার উপর থেকে উঠে জায়গাটা দিনের আলোয় একটু ভাল করে ঘুরে দেখব ভাবছি। এমন সময় একটা আঁশটে গন্ধ আর একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। ঠিক মনে হল যেন একটা বেশ বড় রকমের ঝিঁঝি 'তিন্তিড়ি তিন্তিড়ি' বলে ডাকছে। আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে সেটা বুঝবার চেষ্টা করছি এমন সময় একটা বিকট চিৎকারে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

তারপর দেখলাম প্রহ্লাদকে, তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ডান হাতের মুঠোয় নিউটনকে ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে এক-এক লাফে বিশ-পঁচিশ হাত করে রকেটের দিকে চলেছে।

তার পিছু নিয়েছে যে জিনিসটা সেটা মানুষও নয়, জন্তুও নয়, মাছও নয় কিন্তু তিনের সঙ্গেই কিছু কিছু মিল আছে। লম্বায় তিন হাতের বেশি নয়, পা আছে, কিন্তু হাতের বদলে মাছের মতো ডানা, বিরাট মাথায় মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ, ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সবুজ চোখ, আর সর্বাঙ্গে মাছের মতো আঁশ সকালের রোদে চিকচিক করছে।

জন্তুটা ভাল ছুটতে পারে না, পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। তাই হয়তো প্রহ্লাদের নাগাল

www.BDeBooks.Com

পাবে না।

আমার যেটা সবচেয়ে সাংঘাতিক অস্ত্র সেটা হাতে নিয়ে আমি জন্তুটার পিছনে রকেটের দিকে ছুটলাম, প্রহ্লাদের যদি অনিষ্ট হয় তা হলেই অস্ত্রটা ব্যবহার করব, নয়তো প্রাণীহত্যা করব না।

আমি যখন জন্তুটার থেকে বিশ কি পঁচিশ গজ দূরে, তখনই প্রহ্লাদ রকেটে উঠে পড়েছে। কিন্তু এবারে আরেক কাণ্ড। বিধুশেখর এক লাফে রকেট থেকে নেমে জন্তুটাকে রুখে দাঁড়াল।

ব্যাপার দেখে আমিও থমকে দাঁড়ালাম। এমন সময় একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে আবার সেই আঁশটে গন্ধটা পেয়ে ঘুরেই দেখি ঠিক ওইটার মতো আরও অন্তত দু'-তিনশো জন্তু দূর থেকে দুলতে দুলতে রকেটের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের মুখ দিয়ে সেই বিকট ঝিঁঝির শব্দ—'তিন্তিড়ি ! তিন্তিড়ি ! তিন্তিড়ি ! তিন্তিড়ি ! তিন্তিড়ি—'

বিধুশেখরের লোহার হাতের এক বাড়িতেই জন্তুটা 'চী' শব্দ করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাটিতে পড়ে গেল। পাছে ও রোখের মাথায় একাই ওই মঙ্গলীয় সৈন্যকে আক্রমণ করে, তাই দৌড়ে গিয়ে বিধুশেখরকে জাপটে ধরলাম। কিন্তু ওর গোঁ সাংঘাতিক, আমায় সুদ্ধ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে জন্তুগুলোর দিকে এগিয়ে চলল। আমি কোনওমতে কাঁধের কাছে হাতটা পৌঁছিয়ে বোতামটা টিপে দিলাম, বিধুশেখর অচল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এ দিকে মঙ্গলীয় সৈন্য এখন একশো গজের মধ্যে। তাদের আঁশটে গন্ধে আমার মাথা ঘুরছে। ভৌতিক তিন্তিড়ি চিৎকারে কান ভোঁ ভোঁ করছে।

এখন এই পাঁচ-মনি যন্ত্রের মানুষটাকে রকেটে ওঠাই কী করে ?

প্রহ্লাদকে ডেকে উত্তর পেলাম না।

কী বুদ্ধি হল, হাত দিয়ে বিধুশেখরের কোমরের কবজাটা খুলতে লাগলাম। বুঝতে পারছি মঙ্গলীয় সৈন্যের ঢেউ দুলতে দুলতে ক্রমশই এগিয়ে আসছে। আড়চোখে চেয়ে দেখি এখন প্রায় হাজার জন্তু, রোদ পড়ে তাদের আঁশের চকচকানিতে প্রায় চোখ ঝলসে যায় !

কোনওমতে বিধুশেখরকে দু' ভাগে ভাগ করে ফেলে তার মাথার অংশটা টানতে টানতে রকেটের দরজার সামনে এনে ফেললাম। এবার পায়ের দিকটা। সৈন্য এখন পঞ্চাশ গজের মধ্যে। আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। অস্ত্রের কথা ভুলে গিয়েছি।

পা ধরে টানতে টানতে বিধুশেখরের তলার অংশটা যখন রকেটের দরজায় এনে ফেললাম, তখন দেখি প্রহ্লাদের জ্ঞান হয়েছে। সে এরই মধ্যে ওপরের দিকটা ক্যাবিনের ভিতর তুলে দিয়েছে।

বাকি অংশটা ভিতরে তুলে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করার ঠিক আগের মুহূর্তে আমার পায়ে একটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে ঝাপটা অনুভব করলাম।

তারপর আর কিছুই মনে ছিল না।

যখন জ্ঞান হল দেখি রকেট উড়ে চলেছে। আমার ডান পায়ে একটা চিনচিনে যন্ত্রণা ও ক্যাবিনের মধ্যে একটা মেছো গন্ধ এখনও রয়ে গেছে।

কিন্তু রকেটটা উড়ল কী করে ? চালাল কে ? প্রহ্লাদ তো যন্ত্রপাতির কিছুই জানে না। আর বিধুশেখর তো এখনও দু'খান হয়ে পড়ে আছে। তবে কি আপনিই উড়ল নাকি ? কিন্তু তাই যদি হয় তবে কোথায় চলেছে এই রকেট ? কোথায় যাচ্ছি আমরা ? সৌরজগতের অগণিত গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে কোনটিতে গিয়ে আমাদের পাড়ি শেষ হবে ? শেষ কি হবে, না অনির্দিষ্ট কাল আমাদের আকাশপথে অজানা উদ্দেশে ঘুরে বেড়াতে হবে ?

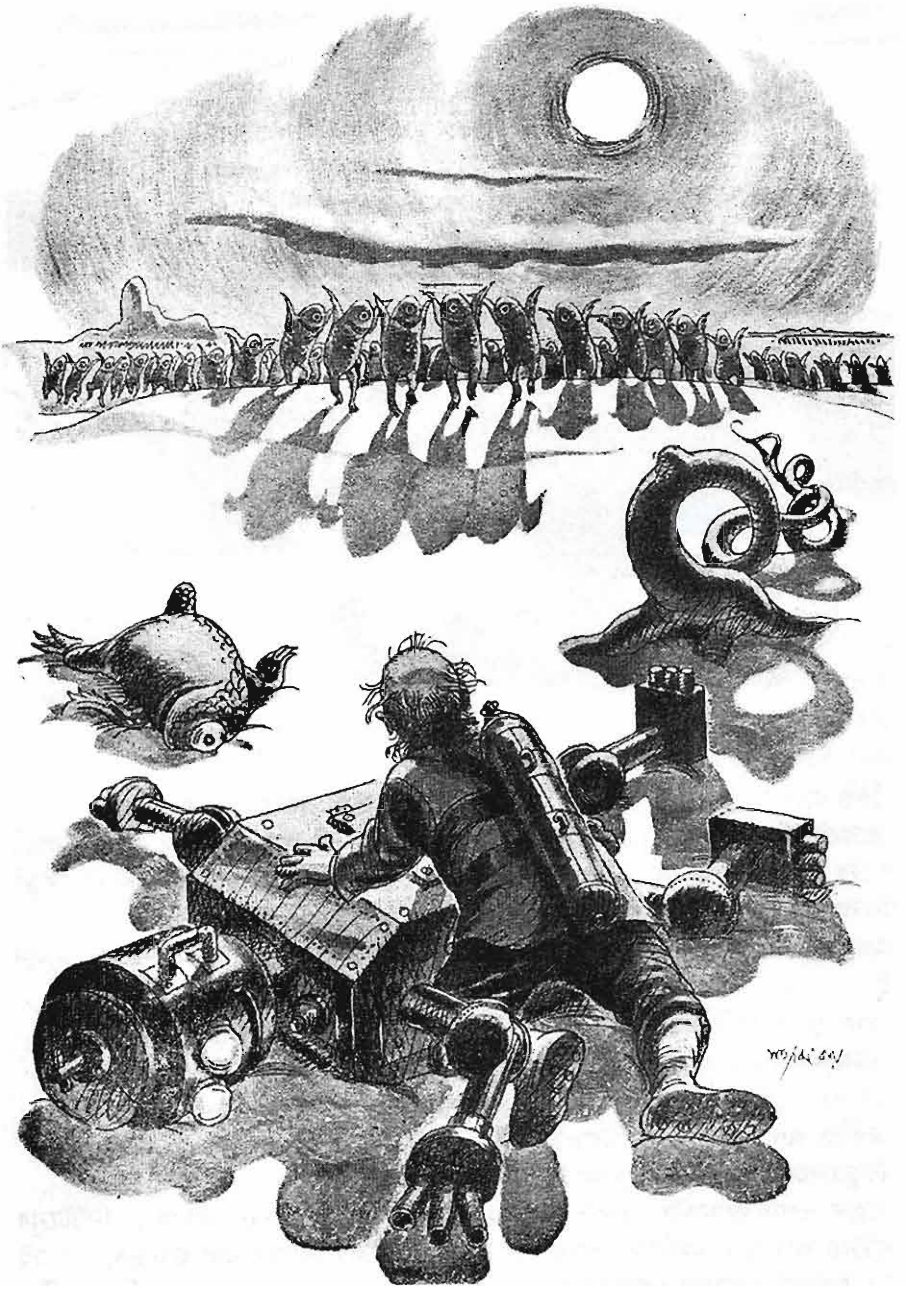

www.BDeBooks.Com

কিন্তু রসদ ? সে তো অফুরন্ত নয়। আর তিন বছর পরে আমরা খাব কী ?

রকেটের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে দেখেছি তার কোনওটাই কাজ করছে না। এই অবস্থায় রকেটের চলবারই কথা নয়। কিন্তু তাও আমরা চলেছি। কী করে চলেছি জানি না, কিছুই জানি না।

মনে অসংখ্য প্রশ্ন গিজগিজ করছে। কিন্তু কোনওটারই উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই।

আজ থেকে আমি অজ্ঞান অসহায়।

ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়, অন্ধকার।

এখনও আমরা একই ভাবে উড়ে চলেছি।

কিছু দেখবার নেই, তাই জানালাটা বন্ধ করে রেখেছি।

প্রহ্লাদ এখন অনেকটা সামলে নিয়েছে। দাঁতকপাটি লাগাটাও কমেছে। নিউটনের অরুচিটাও কমেছে। মঙ্গলীয়ের গায়ে দাঁত বসানোর ফলেই বোধহয় ওটা হয়েছিল। কাণ্ডই বটে ! প্রহ্লাদের কথাবার্তা এখনও অসংলগ্ন, কিন্তু যেটুকু বলেছে তার থেকে বুঝেছি যে নদীর ধারে পাথর কুড়োতে কুড়োতে সে হঠাৎ একটা আঁশটে গন্ধ পায়। তাতে সে মুখ তুলে দেখে কিছু দূরেই একটা না-মানুষ না-জন্তু না-মাছ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আর নিউটন লেজ

খাড়া করে চোখ বড় বড় করে গুটি গুটি সেটার দিকে এগোচ্ছে। প্রহ্লাদ কিছু করার আগেই নিউটন নাকি এক লাফে জন্তুটার কাছে গিয়ে তার হাঁটুতে এক কামড় দেয়। তাতে সেটা ঝিঁঝির মতো এক বিকট চিৎকার করে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই নাকি ঠিক ওই রকম আরেকটা জন্তু কোথা থেকে এসে প্রহ্লাদকে তাড়া করে। তার পরের ঘটনা অবিশ্যি আমার নিজের চোখেই দেখা।

বিধুশেখর আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। তাই খুশি হয়ে এ-ক'দিন আমি ওকে বিশ্রাম দিয়েছি। আজ সকালে প্রহ্লাদ ও আমি ওকে জোড়া দিয়ে ওর কাঁধের বোতাম টিপে দিতেই ও স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ'।

তারপর থেকেই ও আমার সঙ্গে বেশ পরিষ্কার ভাবে প্রায় মানুষের মতো কথা বলছে। কিন্তু কেন জানি না ও চলতি ভাষা না বলে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করছে। বোধ হয় এত দিন প্রহ্লাদের মুখে রামায়ণ মহাভারত শোনার ফল।

আর সময়ের হিসেব নেই। সন-তারিখ সব গুলিয়ে গেছে। রসদ আর কয়েক দিনের মতো আছে। শরীর মন অবসন্ন। প্রহ্লাদ আর নিউটন নির্জীবের মতো পড়ে আছে। কেবল বিধুশেখরের কোনও গ্লানি নেই। ও বিড়বিড় করে সেই কবে প্রহ্লাদের মুখে শোনা ঘটোৎকচবধের অংশটা আবৃত্তি করে যাচ্ছে।

আজও সেই ঝিমধরা ভাবটা নিয়ে বসেছিলাম এমন সময় বিধুশেখর হঠাৎ তার আবৃত্তি থামিয়ে বলে উঠল, 'বাহবা, বাহবা, বাহবা'।

আমি বললাম, 'কী হল বিধুশেখর, এত ফুর্তি কীসের ?'

বিধুশেখর বলল, 'গবাক্ষ উদ্ঘাটন করহ'।

এর আগে বিধুশেখরের কথা না শুনে ঠকেছি। তাই হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। খুলতেই চোখঝলসানো দৃশ্য আমায় কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ করে দিল। যখন দৃষ্টি ফিরে পেলাম, দেখি আমরা এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য জগতের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছি। যত দূর চোখ যায় আকাশময় কেবল বুদ্‌বুদ্ ফুটছে আর ফাটছে, ফুটছে আর ফাটছে। এই নেই এই আছে, এই আছে এই নেই।

অগুনতি সোনার বল আপনা থেকেই বড় হতে হতে হঠাৎ ফেটে সোনার ফোয়ারা ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমি যে অবাক হব তাতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু প্রহ্লাদ যে প্রহ্লাদ, সেও এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। আর নিউটন ? সে ক্রমাগত ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানালার কাচটা খামচাচ্ছে, পারলে যেন কাচ ভেদ করে বাইরে চলে যায়।

সে দিন থেকে আর জানালা বন্ধ করিনি। কারণ কখন যে কোন বিচিত্র জগতের মধ্যে এসে পড়ি তার ঠিক নেই। খিদেতেষ্টা ভুলে গেছি। ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য পরিবর্তন হচ্ছে। এখন দেখছি সারা আকাশময় সাপের মতো কিলবিলে সব আলো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। এক একটা জানালার খুব কাছে এসে পড়ে, আর কেবিনের ভেতরটা আলো হয়ে ওঠে। এ যেন সৌরজগতের কোনও বাদশাহের উৎসবে আতসবাজির খেলা।

আজকের অভিজ্ঞতা এক বিধুশেখর ছাড়া আমাদের সকলের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল।

আকাশভর্তি বিশাল বিশাল গোলাকৃতি এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঁই। তাদের গায়ের সব গহ্বরের ভিতর থেকে অগ্ন্যুদ্‌গার হচ্ছে। আমরা সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে কলিশন

www.BDeBooks.Com

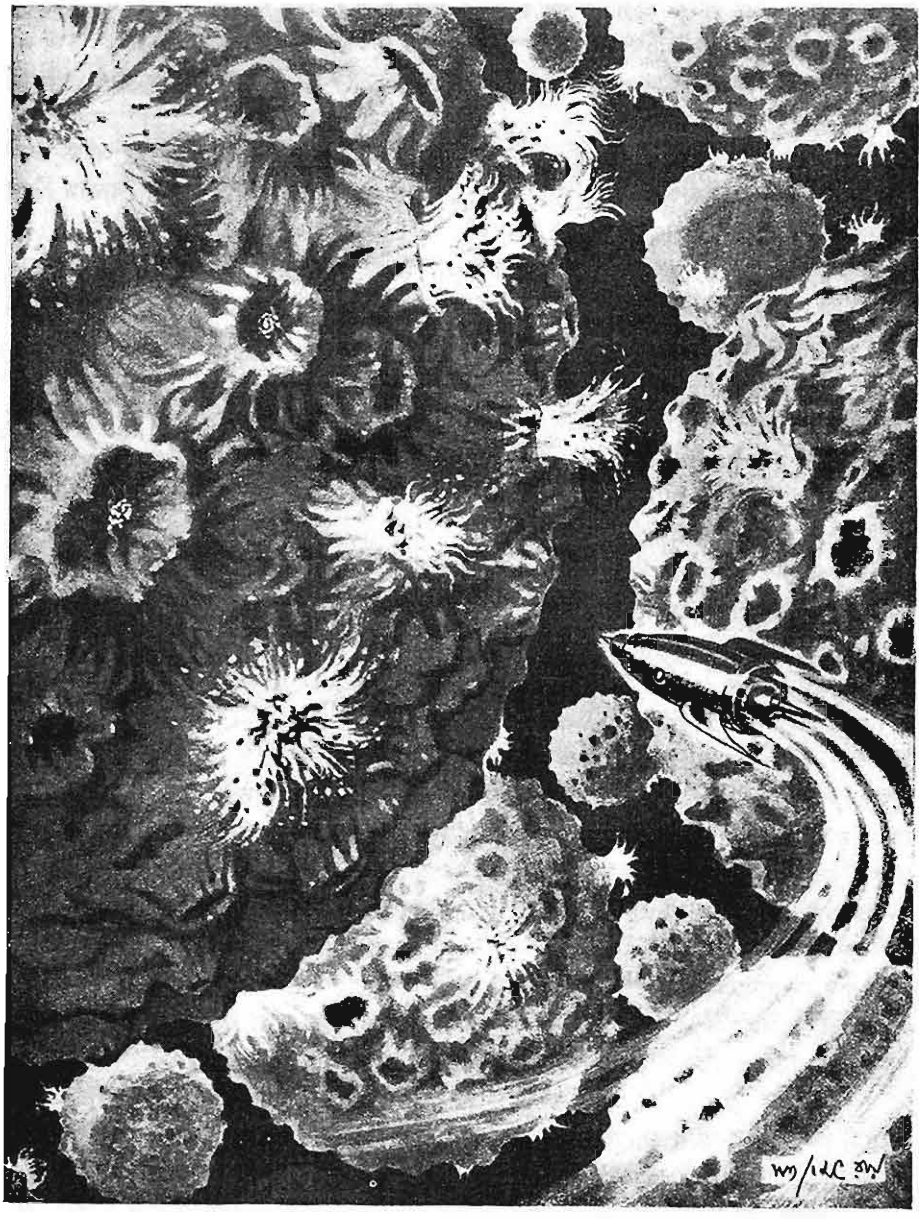

বাঁচিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছি। প্রহ্লাদ ক্রমাগত ইষ্টনাম জপ করছে। নিউটন টেবিলের তলায় ঢুকে থরথর করে কাঁপছে। কতবার মনে হয়েছে এই বুঝি গেলাম, এই বুঝি গেলাম। কিন্তু রকেট ঠিক শেষ মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো মোড় ঘুরে নিজের পথ বেছে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আমরা ভয়ে মরছি, কিন্তু বিধুশেখরের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তার চেয়ারে বসে দুলছে ও

মধ্যে মধ্যে 'টাফা' বলছে।

এই একটা নতুন কথা কদিনই ওর মুখে শুনছি। বোধ হয় বাইরের দৃশ্য দেখে তারিফ করে 'তোফা' কথাটা বলতে গিয়ে টাফা বলছে। আজ নিউটনকে বড়ি খাওয়াচ্ছি এমন সময় বিধুশেখর হঠাৎ এক লাফে জানালার কাছে গিয়ে 'টাফা' বলে চিৎকার করে উঠল। আমি জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি—আকাশে আর কিছু নেই, কেবল একটা ঝলমলে সাদা গ্রহ নির্মল নিষ্কলঙ্ক একটি চাঁদের মতো আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

রকেটটা নিঃসন্দেহে ওই গ্রহটার দিকেই এগিয়ে চলেছে। বিধুশেখরের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে ওটার নাম টাফা।

আজ জানালা দিয়ে অপূর্ব দৃশ্য। টাফার সর্বাঙ্গে যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। সেই আলোয় আমাদের কেবিনও আলো হয়ে গেছে। আমার সেই স্বপ্নের জোনাকির কথা মনে পড়েছে। মন আজ সকলেরই খুশি।

শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের অভিযান ব্যর্থ হবে না।

টাফার দূরত্ব দেখে আন্দাজে মনে হচ্ছে কালই হয়তো আমরা ওখানে পৌঁছে যাব। গ্রহটা ঠিক কী রকম দেখতে সেটা ওই জোনাকিগুলোর জন্য বোঝবার উপায় নেই।

আজ বিধুশেখর যে সব কথাগুলো বলছিল সেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন। আমি ক'দিন থেকেই ওর অতিরিক্ত ফুর্তি দেখে বুঝেছি যে ওর 'মাথা'টা হয়তো আবার গোলমাল করছে।

ও বলল টাফায় নাকি সৌরজগতের প্রথম সভ্য লোকেরা বাস করে। পৃথিবীর সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা নাকি বেশ কয়েক কোটি বছরের পুরনো! ওদের প্রত্যেকটি লোকই নাকি বৈজ্ঞানিক এবং এত বুদ্ধিমান লোক একসঙ্গে হওয়াতে নাকি ওদের অনেক দিন থেকেই অসুবিধে হচ্ছে। তাই কয়েক বছর থেকেই নাকি ওরা অন্যান্য সব গ্রহ থেকে একটি কমবুদ্ধি লোক বেছে নিয়ে টাফায় আনিয়ে বসবাস করাচ্ছে।

আমি বললাম, 'তা হলে ওদের প্রহ্লাদকে পেয়ে খুব সুবিধে হবে বলো।' তাই শুনে বিধুশেখর ঠং ঠং করে হাততালি দিয়ে এমন বিশ্রীরকম অট্টহাসি আরম্ভ করল যে আমি বাধ্য হয়ে তার কাঁধের বোতামটা টিপে দিলাম।

কাল টাফায় পৌঁছেছি। রকেট থেকে নেমে দেখি বহু লোক আমায় অভ্যর্থনা করতে এসেছে। লোক বলছি, কিন্তু এরা আসলে মোটেই মানুষের মতো নয়। অতিকায় পিঁপড়ে জাতীয় একটা কিছু কল্পনা করতে পারলে এদের চেহারার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। বিরাট মাথা, আর চোখ, কিন্তু সেই অনুপাতে হাত-পা সরু—যেন কোনও কাজেই লাগে না। এদের সম্বন্ধে বিধুশেখর যা বলেছিল তা যে একদম ভুল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা আসলে ঠিক তার উলটো। অর্থাৎ এরা মানুষের অবস্থা থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, এবং সে অবস্থায় পৌঁছতে ঢের সময় লাগবে।

টাফার অবস্থা যে পৃথিবীর তুলনায় কত আদিম তা এতেই বেশ বোঝা যায় যে এদের ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই—এমনকী গাছপালাও নেই। এরা গর্ত দিয়ে মাটির ভিতর ঢুকে যায় এবং সেখানেই বাস করে। অবিশ্যি আমাকে এরা ঠিক আমার দেশের বাড়ির মতো একটা বাড়ি দিয়েছে। কেবল ল্যাবরেটরিটাই নেই, আর সবই যেমন ছিল ঠিক তেমনি।

প্রহ্লাদ ও নিউটন দিব্যি আছে। নতুন গ্রহে এসে নতুন পরিবেশে যে বাস করছে সে বোধটাই যেন নেই।

www.BDeBooks.Com

বিধুশেখরকেই কেবল দেখতে পাচ্ছি না, ও কাল থেকেই উধাও। টাফা সম্পর্কে এতগুলো মিথ্যে কথা বলে হয়তো আর মুখ দেখানোর সাহস নেই।

আজ থেকে ডায়রি লেখা বন্ধ করব—কারণ এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না। খাতাটা পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোর কোনও উপায় নেই এটা খুব আক্ষেপের বিষয়। এত মূল্যবান তথ্য রয়েছে এতে! এখানকার মূর্খরা তো মর্ম কিছুই বুঝবে না—আর এ দিকে আমাকেও ফিরে যেতে দেবে না।

ফিরে যাওয়ার খুব যে একটা প্রয়োজন বোধ করছি তাও নয়—কারণ এরা সত্যি আমায় খুবই যত্নে রেখেছে। বোধ হয় ভাবছে যে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নেবে।

এরা বাংলাটা জানল কী করে জানি না—তবে তাতে একটা সুবিধে হয়েছে যে ধমক টমক দিলে বোঝে। সে দিন একটা পিঁপড়েকে ডেকে বললাম, 'কই হে, তোমাদের বৈজ্ঞানিক-টৈজ্ঞানিকরা সব কোথায়? তাদের সঙ্গে একটু কথাটথা বলতে দাও। তোমরা যে ভয়ানক পিছিয়ে আছ।'

তাতে লোকটা বলল, 'ও সব বিজ্ঞানটিজ্ঞান দিয়ে আর কী হবে? যেমন আছেন থাকুন না। আমরা মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসব। আপনার সহজ সরল কথাবার্তা শুনতে আমাদের ভারী ভাল লাগে।'

আহা! যত সব ন্যাকামো।

আমি রেগে গিয়ে আমার নস্যির বন্দুকটা নিয়ে লোকটার ঠিক নাকের ফুটোয় তাক করে মারলাম।

কিন্তু তাতে ওর কিছু হল না।

হবে কী করে? এরা যে এখনও হাঁচতেই শেখেনি!

[অনেকে হয়তো জানতে চাইবে প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রিটা কোথায় এবং এমন আশ্চর্য জিনিসটাকে দেখবার কোনও উপায় আছে কি না। আমার নিজের ইচ্ছে ছিল যে, ডায়রিটা ছাপানোর পর ওর কাগজ ও কালিটা কোনও বৈজ্ঞানিককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তারপর ওটাকে জাদুঘরে দিয়ে দেব। সেখানে থাকলে অবিশ্যি সকলের পক্ষেই দেখা সম্ভব। কিন্তু তা হবার জো নেই। না থাকার কারণটা আশ্চর্য। লেখাটা কপি করে প্রেসে দেবার পর সেই দিনই বাড়ি এসে শোবার ঘরের তাক থেকে ডায়রিটা নামাতে গিয়ে দেখি জায়গাটা ফাঁকা। তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। ডায়রির পাতার কিছু গুঁড়ো আর লাল মলাটটার ছোট্ট একটা অংশ তাকের উপর আছে। এবং তার উপর ক্ষিপ্রপদে ঘোরাফেরা করছে প্রায় শ-খানেক বুভুক্ষু ডেঁয়োপিঁপড়ে। এরা পুরো খাতাটাকে খেয়ে শেষ করেছে, এবং ওই সামান্য বাকি অংশটুকু আমার চোখের সামনেই উদরসাৎ করে ফেলল। আমি কেবল হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

যে জিনিসটাকে অক্ষয় অবিনশ্বর বলে মনে হয়েছিল, সেটা হঠাৎ পিঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হল কী করে সেটা আমি এখনও ভেবে ঠাহর করতে পারিনি। তোমরা এর মানে কিছু বুঝতে পারছ কি?]

সন্দেশ। আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

প্রোফেসর শঙ্কু ও ঈজিপ্সীয় আতঙ্ক

পোর্ট সেইডের ইম্পিরিয়াল হোটেলের ৫ নং ঘরে বসে আমার ডায়রি লিখছি ! এখন রাত সাড়ে এগারোটা। এখানে বোধ হয় অনেক রাত অবধি লোকজন জেগে থাকে, রাস্তায় চলাফেরা করে, হইহল্লা করে। আমার পূর্বদিকের খোলা জানালাটা দিয়ে শহরের গুঞ্জন ভেসে আসছে। দশটা অবধি একটা ভ্যাপসা গরম ছিল। তার পর থেকে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে সুয়েজ ক্যানালের দিক থেকে।

আমার ঈজিপ্টে আসা কতদূর সার্থক হবে জানি না, তবে আজ সারাদিনে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে কিছুটা আশাপ্রদ বলেই মনে হচ্ছে। অনেকদিন থেকেই এদিকটায় একটা পাড়ি দেবার ইচ্ছে ছিল। আমার তো মনে হয় যে কোনও দেশের যে কোনও বৈজ্ঞানিকেরই ঈজিপ্টটা ঘুরে যাওয়া উচিত। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও এরা বিজ্ঞানে যে আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, তা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। এ নিয়ে অনেক কিছু গবেষণা করার আছে। এদের কেমিস্ট্রি, এদের গণিতবিজ্ঞান, এদের চিকিৎসাশাস্ত্র, সব কিছুই সেই প্রাচীন যুগে এক অবিশ্বাস্য পরিণতি লাভ করেছিল।

সবচেয়ে অবাক লাগে এদের mummy-র ব্যাপারটা। মৃতদেহকে এমন এক আশ্চর্য রাসায়নিক উপায়ে ব্যান্ডেজবদ্ধ অবস্থায় কাঠের কফিনে শুইয়ে রেখে দিত, যে পাঁচ হাজার বছর পরেও সেই ব্যান্ডেজ খুলে দেখা গেছে যে মৃতদেহ পচা তো দূরে থাকুক, তার কোনও রকম বিকারই ঘটেনি। এর রহস্য আজ অবধি কোনও বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটন করতে পারেননি।

ইংল্যান্ডের প্রত্নতাত্ত্বিক ডক্টর জেমস্ সামারটন যে বর্তমান ঈজিপ্টের বুবাসটিস অঞ্চলে এক্সক্যাভেশন চালাচ্ছেন সে খবর গিরিডিতে থাকতেই পড়েছিলাম। এই প্রত্নতাত্ত্বিক দলটির সঙ্গে আলাপ করে নেওয়ার উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই ছিল। সামারটনের লেখা ঈজিপ্ট সম্বন্ধে বইগুলো সবই পড়ে নিয়েছিলাম। তিন বছর সাহারায় এক্সক্যাভেশনের ফলে চতুর্থ ডাইন্যাস্টির রাজা খেরোটেপের সেই আশ্চর্য সমাধিকক্ষ সামারটনই আবিষ্কার করেছিলেন। এই সামারটনের সঙ্গে ঈজিপ্টে পদার্পণ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে এমন আশ্চর্যভাবে আলাপ হবে তা কে জানত ?

সকালে হোটেলে এসে আমার ঘরের ব্যবস্থা করেই গিয়েছিলাম ম্যানেজারের কাছে, সামারটনের খোঁজ নিতে।

ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে খবরের কাগজ থেকে দৃষ্টি তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনিও কি একই ধান্দায় এসেছেন নাকি ?'

বলার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগল না। বললাম, 'কেন বলুন তো ?'

ম্যানেজার বললেন, 'তাই যদি হয়, তা হলে আপনাকে সাবধান করে দেওয়াটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। নইলে সামারটনের যা দশা হয়েছে, আপনারও ওই জাতীয় একটা কিছু হবে আর কী।'

'কী হয়েছে সামারটনের ?'

www.BDeBooks.Com

'উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে—আবার কী হবে ? মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সমাধিমন্দিরে অনধিকার প্রবেশের ফলভোগ করছেন তিনি। অবশ্য বেশি দিন কষ্ট পেতে হবে না বোধ হয়। স্ক্যারাব পোকার কামড় খেয়ে কম মানুষই বাঁচে।'

স্ক্যারাব বিট্‌ল-এর কথা বইয়ে পড়েছি। গুবরে জাতীয় পোকা ; পুরাকালে ঈজিপ্সীয়রা দেবতা বলে মান্য করত।

আরও কিছু প্রশ্ন করে জানতে পারলাম গতকাল বুবাসটিস-এ এক্সক্যাভেশনের কাজ করতে করতে সামারটন হঠাৎ নাকি চিৎকার করে পড়ে যান। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা ছুটে এসে দেখে সামারটন তাঁর ডান পায়ের গুলিটা আঁকড়ে ধরে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে পড়ে আছেন আর বলছেন, 'দ্যাট বিট্‌ল ! দ্যাট বিট্‌ল্ !'

পোকাটিকে নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সামারটনকে তৎক্ষণাৎ পোর্ট সেইডের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর অবস্থা নাকি বেশ সঙ্গিন।

খবরটা পেয়ে আর বিলম্ব না করে হাসপাতালের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিলাম আমার তৈরি ওষুধ—মিরাকিউরল। দেশে কত যে করাইত-কেউটের ছোবল খাওয়া ও কাঁকড়াবিছের কামড় খাওয়া লোক এই ওষুধের এক ডোজ খেয়েই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই !

হাসপাতালে গিয়ে দেখি সাহেবের সত্যিই সংকটাপন্ন অবস্থা। কিন্তু আশ্চর্য মনের জোর ভদ্রলোকের। এই অবস্থাতেও শান্তভাবে খাটে শুয়ে আছেন। কেবল মাঝে মাঝে আচমকা ভ্রূকুঞ্চন ও মুখ বিকৃতিতে তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা প্রকাশ পাচ্ছে।

আমি নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর একজন অনুরাগী পাঠক হিসাবে তাঁর দর্শন পাবার জন্য ঘরে ঢুকেছিলাম কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম যে ভদ্রলোক আমার নামে চিনতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়—এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায় ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি আমাকে জানালেন যে আমার লেখা বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক বইই তাঁর পড়া—এবং ভূতপ্রেতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে আমার যে মৌলিক গবেষণামূলক একটি বই আছে—সেটা নাকি তাঁর একটি অতি প্রিয় বই।

আমার উপর এই আস্থার দরুনই বোধহয় আমার ওষুধটা খেতে তাঁর কোনও আপত্তি হল না।

আমি যখন হোটেলে ফিরেছি তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। বিকেল তিনটের কিছু আগে খবর এল সামারটন অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। জ্বর নেই, শরীরের নীল ভাবটা কেটে গেছে, যন্ত্রণাও অনেক কম। আগামীকাল সকালের মধ্যে যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন এ বিষয় আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কাল সকালে সামারটনের সঙ্গে দেখা করে কয়েকদিনের জন্য তাঁর সঙ্গ নেওয়ার প্রস্তাবটা করতে হবে।

৮ই সেপ্টেম্বর রাত ১২টা

আজ ভোরে উঠেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সামারটন একেবারে সুস্থ। গুবরের কামড়ের দাগটা পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে একদিনেই মিলিয়ে গেছে। আমার ওষুধের গুণ দেখে আমি নিজেই অবাক। কী সব অদ্ভুত জিনিসের সংমিশ্রণে ওই ওষুধ তৈরি হয়েছে সেটা আর সামারটনকে বললাম না। বিশেষত গলদা চিংড়ির গোঁফের কথাটা বললে হয়তো তিনি আমাকে পাগলই ঠাউরে বসতেন। যাই হোক—আমার প্রতি সামারটনের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এক্সক্যাভেশনে সঙ্গ নেবার কথাটা আর আমাকে বলতে হল না—উনি নিজেই

বললেন। আমি অবশ্য তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম।

ইনিও দেখলাম মামির ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু। শুধু তাই নয়—এই যে সব ভূগর্ভস্থ প্রাচীন সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করে তার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা, এর ফলে যে কোনও প্রাচীন অভিশাপ সামারটন বা তাঁর দলভুক্ত কাউকে স্পর্শ করে তার অনিষ্ট হতে পারে, এ বিশ্বাসও যে সামারটনের আছে। যে গুব্‌রে পোকাটি তাঁকে কামড়েছে, তাঁর ধারণা সেটি হল সেই স্ক্যারাব গুব্‌রে—যাকে নাকি ঈজিপ্সীয়রা পুজো করত। সামারটন যে মন্দিরে কাজ করছেন তার দেওয়ালে নাকি এই গুবরের খোদাই করা প্রতিমূর্তি রয়েছে। ঈজিপ্সীয়রা যে জন্তু জানোয়ার মাছ পাখির অনেক কিছুকেই দেবতার অবতার বলে পুজো করত সে তথ্য আমার জানা ছিল। আমি সামারটনকে বললাম, 'কোন একটা জায়গায় নাকি এক্সক্যাভেশনের ফলে একটা বেড়ালের সমাধি মন্দির পাওয়া গেছে?'

সামারটন বললেন, 'আরে, সে তো এই বুবাসটিসেই—আমি এখন যেখানে কাজ করছি সেখানে। অবিশ্যি এটা অনেকদিনের আবিষ্কার। শতখানেক বেড়ালের সমাধি রয়েছে সেই ঘরটায়। ঠিক মানুষকে যে ভাবে mummify করে কফিনে বন্ধ করে রাখা হত বেড়ালকেও ঠিক সেইভাবেই রাখা হয়েছে। বেড়াল ছিল নেফ্‌দেৎ দেবীর অবতার।'

আমি স্থির করলাম সময় ও সুযোগ পেলে এই বিচিত্র সমাধিকক্ষ দেখে আসব। বেড়াল আমার অতি প্রিয় জিনিস। বাড়িতে আমার পোষা নিউটনকে রেখে এসেছি। তার কথা মনে হলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

সামারটনের সঙ্গে দেখা করে যখন হোটেলে ফিরছি তখন বেলা বেড়ে গিয়ে বেশ গনগনে রোদ উঠেছে। হোটেলের সামনে একটা স্থানীয় লোক আমায় দেখে আমার দিকে এগিয়ে এল। লোকটা লম্বায় ছ'ফুটের ওপর, গায়ের রং পোড়া তামাটে, চুল ছোট করে ছাঁটা ও পাকানো, চোখ দুটো কোটরে বসা, চাহনি তীক্ষ্ণ ও নির্মম।

লোকটা এগিয়ে এসে তার ডান হাতটা অত্যন্ত উদ্ধতভাবে আমার কাঁধের উপর রাখল। তারপর আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি রেখে ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'আপনাকে তো ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে, তবে আপনি এই শ্বেতাঙ্গ বর্বরদের দলে ভিড়ছেন কেন? আমাদের দেশের সব পবিত্র প্রাচীন জিনিস নিয়ে আপনাদের এত কী মাথা ব্যথা?'

আমি পালটা বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললাম, 'কেন, তাতে কী হয়? প্রাচীন জিনিস নিয়ে মাথা ঘামালেই কি তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়? আপনি জানেন আমি প্রাচীন ঈজিপ্সীয় সভ্যতার প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা নিয়ে এদেশে এসেছি?'

লোকটার চোখদুটো যেন জ্বল জ্বল করে উঠল। তার ডান হাতটা তখনও আমার কাঁধে। সেই হাত দিয়ে একটা চাপ দিয়ে সে বলল, 'শ্রদ্ধা এক জিনিস, আর শাবল লাগিয়ে মাটি খুঁড়ে পবিত্র সমাধিকক্ষে প্রবেশ করে মৃতব্যক্তির আত্মার অবমাননা করা আর এক জিনিস। সামারটন সাহেব কোথায় কাজ করছেন তা জানেন?'

'জানি। বুবাসটিসে চতুর্থ ডাইনাস্টির রাজা থেফ্রেসের আমলের একটি সমাধিকক্ষে।'

'সেইখানে আমার পূর্বপুরুষদের সমাধি আছে সেটা আপনি জানেন?'

আমি তো হো হো করে হেসে উঠে বললাম, 'আপনি দেখছি আপনার চৌদ্দশ' পুরুষ অবধি খবর রাখেন।'

লোকটা যেন আরও খেপে উঠল। তার ডান হাত দিয়ে আমার কাঁধে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'রাখি কি না রাখি তা ওইসব মন্দিরে আরেকটু ঘোরাঘুরি করে দেখুন না, তা হলেই টের পাবেন।'

www.BDeBooks.Com

এই বলে লোকটা আমায় ছেড়ে হনহনিয়ে রাস্তার দিকে চলে গিয়ে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল। আমিও হাঁফ ছেড়ে আমার ঘরে চলে গেলাম।

সামারটন কালকেই ফিরে যাবেন তাঁর কাজের জায়গায় এবং আমি যাব তাঁর সঙ্গে। জিনিসপত্তর এইবেলা গোছগাছ করে রাখা ভাল। মনে মনে একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। সেবার নীলগিরি অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার সময়ও ঠিক এইরকম হয়েছিল। বেড়ালের সমাধি! ভাবলেও হাসি পায়!...

কাল সামারটনকে এই উদ্ধতস্বভাব আধপাগলা ঢ্যাঙা লোকটার কথা বলতে হবে। আমার মনে হয় ব্যাপারটা আর কিছু নয়—আসলে এইসব পুরনো মন্দিরে অনেক সময়েই মূল্যবান পাথরবসানো সব গয়নাগাঁটি পাওয়া যায়। এইসব স্থানীয় লোকেরা তা ভালভাবেই জানে এবং এরা হয়তো মনে করে যে হুমকি দিয়ে, অভিশাপের ভয় দেখিয়ে, নিরীহ প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে এই সব পাথরবসানো জিনিসের কয়েকটা আদায় করে নিতে পারবে। তবে লোকটা যদি বেশি জ্বালাতন করে আমি স্থির করেছি ওকে হাঁচিয়ে মারব। আমার snuff gun বা নস্যাস্ত্রটা সঙ্গে এনেছি। নাকে তাগ করে মারলে দু' দিন ধরে অনর্গল হাঁচি চলবে। তারপর দেখব বাবাজি আর বিরক্ত করতে আসে কি না।

১০ই সেপ্টেম্বর

আমরা কাল সকালে বুবাসটিসে এসে পৌঁছেছি। সামারটনের সঙ্গে কাল দুপুরে সদ্যখনিত চার-হাজার বছরের পুরনো সমাধিকক্ষে নেমেছিলাম। এ যে কী অদ্ভুত অনুভূতি তা লিখে বোঝানো দুষ্কর। একটা সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নেমে সঙ্কীর্ণতর সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ঘরটায় প্রবেশ করতে হয়। সামারটনের অনুমান এটা কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সমাধিকক্ষ। বেশ বড় একটি হলঘরের মাঝখানে কারুকার্য করা কাঠের কফিন। ঘরের চারপাশে আরও ছোট ছোট সারবাঁধা সব ঘর—তার প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি করে কফিন। এতে নাকি এই গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিষদবর্গের মৃতদেহ রয়েছে। ঈজিপ্সীয়রা বিশ্বাস করত মৃতব্যক্তির আত্মা নাকি মৃতদেহের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে এবং জীবিত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যা কিছু প্রয়োজন হয়, এই সব মৃত আত্মারও নাকি সেই সবের প্রয়োজন হয়। তাই কফিনের পাশে দেখলাম খাবার পাত্রে খাদ্যদ্রব্য, মদের পিপেতে মদ, পোশাকআশাক, প্রসাধনের জিনিস, খেলাধূলার সরঞ্জাম, সবই রাখা হয়েছে।

সামারটন একটা কফিনের ডালা খুলে তার ভিতরের মামিটা আমায় দেখিয়ে দিলেন। হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যান্ডেজে আবৃত। ডালা খুলতেই একটা উগ্র গন্ধ নাকে প্রবেশ করল। আমি অবাক বিস্ময়ে মৃতদেহটি দেখতে লাগলাম। কত বইয়ে পড়েছি এই মামির কথা!

মামির বুকের উপর সেই চার হাজার বছরের পুরনো প্যাপাইরাস কাগজে ঈজিপ্সীয় হাইরোগ্লিফিক ভাষায় কী যেন লেখা রয়েছে। এ ভাষা আমার জানা নেই। সামারটন অবশ্যই জানেন। কিন্তু আধুনিক ভাষার মতো এ তো আর গড়গড় করে পড়া যায় না। এ ভাষা বুঝতে সময় লাগে। সামারটন বললেন, 'ওই প্যাপাইরাসে মৃতব্যক্তির পরিচয় রয়েছে। শুধু যে নামধাম তা নয়। কবে কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে তাও লেখা রয়েছে।'

সারাদিন সমাধিকক্ষে ঘোরাঘুরির পর সন্ধ্যার দিকে তাঁবুতে ফেরার পথে সামারটন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো মনে কর ভূত প্রেত বা অলৌকিক সব কিছুরই একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাই না? অন্তত তোমার বই পড়ে তো তাই মনে হয়।'

আমি বললাম, 'সেটা ঠিকই। তবে আমি এটাও মানি যে বিজ্ঞান যেমন অনেক দিকে এগোতে পেরেছে তেমনি আবার অনেক কিছুরই হদিস এখনও পর্যন্ত পায়নি। এই যেমন স্বপ্ন কেন দেখে মানুষ এই নিয়ে তো বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে আমি বিশ্বাস করি যে পঁচিশ কি পঞ্চাশ কি অন্তত একশো বছরের মধ্যে জগতের সব রহস্যেরই কারণ বৈজ্ঞানিকরা জেনে ফেলবেন।'

সামারটন একটু ভেবে বললেন, 'এই যে সব প্রাচীন সমাধিকক্ষে আমরা প্রবেশ করছি, এখানকার অনেকের মতে তাতে নাকি আমাদের প্রতি মৃতব্যক্তির আত্মা অসন্তুষ্ট হচ্ছে। এমনকী তারা নাকি আমাদের উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ করছে। হয়তো একদিন আমাদের এই পাপের ফল ভোগ করতে হবে।'

কথাটা শুনে আমি হেসে ফেললাম, কারণ সে দিনের সেই পাগলটার কথা আমার মনে পড়ে গেল।

সামারটনকে লোকটার কথা বলতে তিনিও হেসে ফেললেন। বললেন, 'আরে, ও তো প্রথম দিন থেকেই আমার পেছনে লেগেছে। আমাকেও হুমকি দিয়েছিল এসে। ও আর কিচ্ছু না—কিছু বকশিস পেলেই ও আর জ্বালাতন করবে না।'

আমি বললাম, 'তা দিয়ে দিলেই তো পারেন। আপদ বিদেয় হয়।'

সামারটন মাথা নেড়ে বললেন, 'এই সব ছ্যাঁচড়া লোকগুলোর পেছনে অর্থব্যয় করার ইচ্ছে নেই আমার। এতে ওদের লোভ আরও বেড়ে যায়। ভবিষ্যতে যাঁরা এই সব কাজে এখানে আসবেন তাঁদের কথাও তো ভাবতে হবে আমাদের। তার চেয়ে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাই ভাল। কিছুদিন বিরক্ত করে লাভের আশা নেই দেখে আপনিই সরে পড়বে।'

তাঁবুতে ফিরে শরবত খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে একটা ক্যানভাসের ডেকচেয়ার নিয়ে বাইরে বসলাম। পশ্চিমদিকে চেয়ে দেখি অস্তগামী সূর্যের সামনে গিজার পিরামিডটা গাঢ় ধূসর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই পিরামিড যে প্রাচীন যুগে কী ভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল তা আজও ঠিক বোঝা যায়নি।

তাঁবুর উত্তর দিকে এক লাইন খেজুর গাছ। তার একটার মাথায় দেখলাম গোটা তিনেক শকুনি থুম হয়ে বসে আছে। শকুনিকেও নাকি পুরাকালে এরা দেবতার অবতার বলে মনে করত। আশ্চর্য জাত ছিল এই প্রাচীন ঈজিপ্সীয়রা!

১২ই সেপ্টেম্বর

আজ সামারটন একটা প্রস্তাব করে আমাকে একেবারে হকচকিয়ে দিলেন এবং প্রস্তাবটা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে মৃত্যুর কবল থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য তিনি আমার প্রতি কী গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সারাদিন বুবাসটিসের বেড়ালের সমাধিকক্ষ দেখে সন্ধ্যার দিকে যখন তাঁবুতে ফিরছি তখন পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সামারটন হঠাৎ বললেন, 'শ্যাঙ্কু, তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার প্রতিদানে আমি কী করতে পারি সেই চিন্তাটা ক'দিন থেকে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আজ একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে, এখন সেটা তোমার মনঃপূত হয় কি না জানা দরকার।'

এই পর্যন্ত বলে সামারটন একটু দম নেবার জন্য থামলেন। গুবরের কামড় যে ভেতরে ভেতরে তাঁকে বেশ দুর্বল করে দিয়েছে সেটা বুঝতে পারা যায়। কিছুটা পথ চলার পর সামারটন বললেন, 'তোমার তো মামি নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে আছে। ধরো যদি আমার

www.BDeBooks.Com

আবিষ্কৃত মামিগুলোর মধ্যে একটা তোমাকে দেওয়া যায়—তুমি কি খুশি হবে, না অখুশি হবে ?'

আমি প্রস্তাবটা শুনে এমন অবাক হয়ে গেলাম যে প্রথমে আমার মুখ দিয়ে কথাই সরল না। আমার এক্সপেরিমেন্টের জন্য একটা নিজস্ব মামি নিয়ে দেশে ফিরতে পারব এ আমার স্বপ্নের অতীত। কোনওমতে ঢোক গিলে বললাম, 'একটা মামি নিয়ে যেতে পারলে, আমার এ অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক হবে বলেই আমি মনে করি এবং এ ঘটনা যদি ঘটে তা হলে আমি তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

সামারটন মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি কী চাও ? বেড়াল, না মানুষ ?'

আমার গবেষণার জন্য অবিশ্যি বেড়াল আর মানুষে কোনও তফাত হত না কিন্তু আমার প্রিয় নিরীহ নিউটনের কথা ভেবে কেন জানি বেড়ালের মামি সঙ্গে নিতে মন চাইল না। নিউটন সব সময়েই আমার ল্যাবরেটরির আশেপাশে ঘুরঘুর করে। হঠাৎ একদিন চার হাজার বছরের পুরনো বেড়ালের মৃতদেহ সেখানে দেখলে তার যে কী মনোভাব হতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন। আমি তাই বললাম, 'মানুষই প্রেফার করব।'

সামারটন বললেন, 'বেশ তো—কিন্তু নেবে যখন একটা ভাল জিনিসই নাও। বুবাসটিসেই বেড়ালের কবরস্থানের কাছেই আরেকটা সমাধিকক্ষ আমি আবিষ্কার করেছি যাতে প্রায় ত্রিশ জন মানুষের মামি রয়েছে। এরা যে কী ধরনের লোক ছিল সেটা এখনও বুঝতে পারা যায়নি। আমার মনে হয় এদের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনও রহস্য জড়িত আছে। এদের কফিনে প্যাপাইরাস কাগজে যে হাইরোগ্লিফিক লেখা আছে তার মধ্যেও একটা যেন বিশেষত্ব আছে—আমি এখনও পড়ে উঠতে পারিনি। তোমাকে এই ত্রিশটির মধ্যে একটি কফিন দিয়ে দেব। কিন্তু তার ভেতর থেকে লেখাটা আমি বার করে নেব। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে পাঠোদ্ধার করে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। তার মধ্যে তুমি যা গবেষণা চালাবার তা চালিয়ে যেয়ো—এবং তোমার ফাইন্ডিংস আমাকে জানিয়ে দিও। মামির রাসায়নিক রহস্য তুমি যদি উদ্ঘাটন করতে পার তা হলে হয়তো একদিন নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পার।'

আমার আর ঈজিপ্টে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। সামারটনের দেওয়া কফিনটি প্যাকিং কেসে ভরে ফেলে জাহাজে নিয়ে দেশে ফিরতে পারলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে ! তারপর গবেষণার জন্য তো অফুরন্ত সময় পড়ে আছে। সত্যি, সামারটনের বদান্যতার কোনও তুলনা নেই। আসলে বৈজ্ঞানিকেরা ভিন্ন দেশবাসী হলেও তারা কেমন যেন পরস্পরের প্রতি একটা আত্মীয়তা অনুভব করে। সামারটনের সঙ্গে আমার তিনদিনের আলাপ কিন্তু মনে হচ্ছে যেন তিনি আমার বহুকালের পরিচিত।

১৫ই সেপ্টেম্বর

আজ সকালে পোর্ট সেইডে ফিরেছি। এসেই এক বিদঘুটে ঘটনা। আমার হোটেলের কাছেই একটা বড় দোকান থেকে একটা চামড়ার পোর্টফোলিও কিনে রাস্তায় বেরোতেই সেই পাগলাটে লম্বা লোকটির সঙ্গে একেবারে চোখাচুখি। শুধু তাই নয়—সে এগিয়ে এসে আমার শার্টের কলারটা একেবারে চেপে ধরেছে। আমি তো রীতিমতো ভ্যাবাচাকা। সত্যি বলতে কী গত কয়দিনের আনন্দ উত্তেজনায় আমি লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আর এ ধরনের কোনও বিপদের আশঙ্কা করিনি বলেই বোধ হয় আমার সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না।

লোকটা রক্তবর্ণ চোখ করে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সেই ভাঙা ইংরেজিতে বলল,

www.BDeBooks.Com

'তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, তুমি আমার কথা শুনলে না। সেই আমারই পূর্বপুরুষের মৃতদেহ নিয়ে চলেছ তুমি নিজের দেশে। এর জন্যে কী শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে তা তুমি ধারণাও করতে পারো না। এর প্রতিশোধ আমি নিজে নেব। আমি নিজে স্বহস্তে এই অপরাধের শোধ তুলব।'

এই বলে লোকটা আমার কলারটাকে খামচিয়ে চাপ দিয়ে প্রায় আমার শ্বাসরোধ করার উপক্রম করছিল এমন সময় রাস্তারই একটা পুলিশ দৌড়ে এগিয়ে এসে গায়ের জোরে লোকটাকে ছাড়িয়ে দিল। পথচারী কয়েকজন লোকও আমার বিপদ দেখে এগিয়ে এসেছিল। তারা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল 'ও লোকটা ওই রকমই পাগল। অনেকবার হাজত গেছে—আবার ছাড়া পেলেই উৎপাত করে।'

পুলিশটাও বলল, যে আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। লোকটিকে উত্তমমধ্যম দিয়ে তাকে শায়েস্তা করার বন্দোবস্ত করা হবে।

আমার নিজেরও তেমন উদ্বেগের কোনও কারণ ছিল না। চার দিন বাদেই ভারতগামী জাহাজে আমার প্যাসেজ বুক করা হয়ে গেছে। সঙ্গে যাবে সামারটনের দেওয়া খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছরের পুরনো ঈজিপ্সীয়ের মৃতদেহ। দেশে গিয়ে তার ব্যান্ডেজ খুলে চলবে তার উপর গবেষণা। মামির রাসায়নিক রহস্য আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে।

১৭ই সেপ্টেম্বর

লোহিত সাগরের উপর দিয়ে আমার জাহাজ চলেছে। সমুদ্র রীতিমতো রুক্ষ—কিন্তু তাতে আমার শরীরে কোনও কষ্ট নেই—কেবল কলমটা সোজা চলে না বলে লিখতে যা একটু অসুবিধে। জাহাজের মালঘরে প্যাকিং কেসে বন্ধ কফিন! আমার মন পড়ে রয়েছে সেখানেই। সামারটন বন্দরে এসেছিলেন আমাকে গুডবাই করতে। তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম, কফিনের লেখাটা পড়া হলেই সেটা যেন আমাকে জানিয়ে দেন! তাঁকে এও বললাম যে অবসর পেলে তিনি যেন আমার অতিথি হয়ে গিরিডিতে এসে আমার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে যান।

জাহাজ যখন ছাড়ছিল তখন ডাঙার দিকে চেয়ে ভিড়ের মধ্যে একটা উঁচু মাথা দেখতে পেলাম। দুরবিনটা চোখে লাগিয়ে দেখি সেই পাগলটা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার চোখে ও ঠোঁটের কোণে ক্রূর হিংস্র হাসি আমি কোনও দিনও ভুলব না। পুলিশবাবাজি বোধ হয় শায়েস্তা করতে পারেনি লোকটাকে।

লোহিত সাগরের উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। এবার লেখা বন্ধ করতে হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর

আজ সকালে গিরিডি পৌঁছেছি। বুবাসটিসের মরুভূমিতে রোদে পুড়ে আমার রংটা যে বেশ কয়েক পোঁচ কালো হয়েছে সেটা আমার চাকর প্রহ্লাদের অবাক দৃষ্টিতে প্রথম খেয়াল করলাম। আমার ঘরের আয়না অবশ্য সে অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করল।

নিউটন এগিয়ে এসে আমার পাৎলুনে তার গা ঘষতে আরম্ভ করল। আর মুখে সেই চিরপরিচিত স্নেহসিক্ত মিউ মিউ শব্দ। ভাগ্যিস বেড়ালের মৃতদেহ আনিনি সঙ্গে করে। নিউটন কোনওমতেই বরদাস্ত করতে পারত না ওটা।

কফিনটা ল্যাবরেটরির অনেকখানি জায়গা দখল করে বসেছে। আমার আর তর সইছিল

না তাই দুপুরের মধ্যেই কফিনটা প্যাকিং কেস থেকে বার করিয়ে নিয়েছি।

আজই প্রথম কফিনটাকে ভাল করে লক্ষ করলাম। তার চারপাশে এবং ঢাকনার উপরটা সুন্দর কারুকার্য করা হয়েছে। ঈজিপ্সীয়রা কাঠ খোদাইয়ের কাজে যে কতদূর দক্ষতা অর্জন করেছিল তা এই কাজ থেকেই বোঝা যায়।

কফিনের ডালাটা খুলতে আর একটা বাক্স বেরোল। সেটা আকারে একটা শোয়ানো মানুষের মতো। অর্থাৎ ভিতরে যে মৃতদেহটি রয়েছে এটা তারই একটা সহজ প্রতিকৃতি। এর চোখ নাক মুখ সবই রয়েছে আর সর্বাঙ্গে রয়েছে রঙিন তুলির নকশা।

এই দ্বিতীয় বাক্সের ঢাকনাটা খুলতেই সেই চেনা গন্ধটা পেলাম আর ব্যান্ডেজমোড়া মৃতদেহটি দেখতে পেলাম। অন্য সব মামির যেমন দেখেছি, এরও তেমনি হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করা। আপাদমস্তক ব্যান্ডেজমোড়া তাই লোকটার চেহারা কেমন তার কোনও আন্দাজ পেলাম না। তবে লোকটি যে লম্বা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমার চেয়ে প্রায় এক হাত বেশি। অর্থাৎ ছ ফুটের বেশ উপরে।

ব্যান্ডেজ খোলার কাজটা আগামীকালের জন্য রেখে দিলাম। আজ বড় ক্লান্ত ; তা ছাড়া আমার গবেষণার সরঞ্জামও সব পরিষ্কার করে রাখতে হবে। উশ্রীর বালি কিছুটা এসে জমেছে তাদের মধ্যে।

অবিনাশবাবুকে কাল খবর দিয়ে ডেকে এনে এই বাক্সের ডালা খুলে দেখিয়ে দেব ; আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা তাঁর একটা বাতিক। এটা দেখলে পর কিছুদিনের জন্য বোধ হয় মুখটা বন্ধ হবে। এই কিছুক্ষণ আগে দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে আমি তো অবিনাশবাবু মনে করে প্রহ্লাদকে দেখতে পাঠিয়েছিলাম। সে ফিরে এসে বলল কেউ নেই। তা হলে বোধ হয় ঝড়ের শব্দ হচ্ছিল। ক' দিন থেকেই নাকি এখানে ঝড় বৃষ্টি চলেছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর

কাল যা ঘটনা ঘটে গেছে তারপর আর ডায়রি লেখার সামর্থ্য ছিল না। তাই আজ সকালে ঠাণ্ডা মাথায় কালকের ঘটনাটা লেখার চেষ্টা করছি। পরশুর ডায়রিতে সন্ধ্যাবেলা দরজায় ধাক্কার কথা লিখেছি, তখন ভেবেছিলাম বুঝি ঝড়ে এই রকম শব্দ হচ্ছে। রাত এগারোটা নাগাদ ঝড়টা থেমে যায়। আমার ঘুমও এসে যায় তার কিছুক্ষণ পরেই। ক'টার সময় ঠিক খেয়াল নেই, আবার সেই ধাক্কার শব্দে ঘুমটা ভেঙে যায়।

প্রহ্লাদ আমার ঘরের বাইরের বারান্দায় শোয়। ওর আর সবই ভাল কেবল দোষের মধ্যে ঘুমটা অতিরিক্ত গাঢ়। এই ধাক্কার শব্দে ওর ঘুমের কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। অগত্যা আমি নিজেই আমার টর্চটা হাতে করে চললাম দেখতে কে এল এত রাত্রে।

নীচে গিয়ে সদর দরজা খুলে কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। টর্চের আলো ফেলে চারিদিকটা দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ আমার হাতটা নীচে নামায় আলোটা দরজার চৌকাঠের ঠিক সামনে সিঁড়ির উপর পড়াতে দেখি সেখানে ভিজে পায়ের ছাপ। আর সেই পায়ের আয়তন দেখেই মনের ভেতরটা খচ খচ করে উঠল। গিরিডি শহরে এত বড় পায়ের ছাপ কার হতে পারে ?

যারই হোক না কেন তিনি উধাও হয়েছেন। এবং একবার এসে যখন ফিরে গেছেন, তখন আশা করা যায় যে এত রাত্রে হয়তো তাঁর আর পুনরাগমন ঘটবে না।

আমি দরজা বন্ধ করে ফিরে গেলাম আমার শোবার ঘরে। যাবার পরে কী জানি খেয়াল হল, ল্যাবরেটরির ভিতরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিলাম। কোনও পরিবর্তন বা

www.BDeBooks.Com

অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করলাম না। কফিন যেখানে ছিল সেখানেই আছে, ডালাও বন্ধই আছে।

ল্যাবরেটরির থেকে বেরিয়ে দেখি নিউটন বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, তার লোমগুলো খাড়া আর সর্বাঙ্গে কেমন যেন তটস্থ ভাব। হয়তো দরজা ধাক্কার শব্দতেই নিউটনের ঘুম ভেঙে গেছে, এবং এত রাত্রে আমার বাড়িতে এ ধরনের ঘটনা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলেই সে নিজেও অসোয়াস্তি বোধ করছে।

আমি নিউটনকে কোলে তুলে আমার শোবার ঘরে নিয়ে এলাম। তারপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিউটনকে খাটের পাশেই মেঝেতে কার্পেটে শুইয়ে দিয়ে নিজেও বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

পরদিন—অর্থাৎ গতকাল—সকাল সকাল উঠে কফি খেয়ে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে হাজির হলাম। ঘণ্টা দু'-এক ধরে আমার কাচের সরঞ্জামগুলো পরিষ্কার করলাম। টেস্টটিউব, রিটর্ট, জার, বোতল, ফ্লাস্ক—এ সবগুলোতেই ধুলো পড়েছিল।

তারপর প্রহ্লাদকে বললাম, আমি যতক্ষণ ল্যাবরেটরিতে আছি ততক্ষণ যেন কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া না হয় এবং সে নিজেও যেন ওয়ার্নিং না দিয়ে না ঢোকে।

তারপরে কফিনের পাশে সরঞ্জাম সমেত একটা টেবিল ও আমার নিজের বসার জন্য একটা চেয়ার এনে আমার কাজ শুরু করে দিলাম। মৃতদেহকে অবিকৃত অবস্থায় রাখার জন্য ঈজিপ্সীয়রা যে সব মশলা ব্যবহার করত তার মধ্যে ন্যাট্রন, কস্টিক সোডা, বিটুমেন, বলসাম ও মধুর কথা জানা যায়। কিন্তু এ ছাড়াও এমন কোনও জিনিস ঈজিপ্সীয়রা ব্যবহার করত যার কোনও হদিস পরীক্ষা করেও পাওয়া যায়নি। আমাকে অজ্ঞাত উপাদানগুলি গবেষণা করে বার করতে হবে।

বাক্সের ডালা ও কফিনের ডালা খুলে আমি আর একবার ব্যান্ডেজ পরিবৃত মামিটার দিকে চেয়ে দেখলাম। মৃতদেহের কোনও বিকার না ঘটলেও, চার হাজার বছরে ব্যান্ডেজগুলো কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। খুব সাবধানে চিমটে দিয়ে খুলতে হবে সেগুলোকে।

হাতে দস্তানা ও মুখে মাস্ক পরে আমার কাজ শুরু করে দিলাম।

মাথার ওপর থেকে ব্যান্ডেজটা খুলতে শুরু করে প্রথম কপাল এবং তারপরে মুখের বাকি অংশটা বেরোতে আরম্ভ করল। কপালটা বেশি চওড়া নয়। চোখদুটো কোটরে ঢোকা। নাক বেশ উঁচু। ডানদিকের গালে ওটা কী ? তিনটে গভীর ও লম্বা দাগ। কোনও তীক্ষ্ণ জিনিস দিয়ে চেরা হয়েছে যেন গালের চামড়াকে। তলোয়ার যুদ্ধে এ দাগ সম্ভব কি ? কিন্তু তা হলে তিনটে হবে কেন ? আর দাগগুলো সমান্তরালভাবেই বা যাবে কেন ?

ঠোঁটের কাছটা পর্যন্ত যখন বেরিয়েছে তখনই যেন মুখটা কেমন চেনা চেনা বলে মনে হল। এই চোয়াল, এই চোখ, এই নাক—কোথায় দেখেছি এ চেহারা ? মনে পড়েছে। পোর্ট সেইডের সেই পাগলের সঙ্গে এ চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য।

কিন্তু সেটা তো তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের বাঙালিদের পরস্পরের মধ্যে যেমন চেহারার পার্থক্য দেখা যায়—ঈজিপ্সীয়দের মধ্যে পার্থক্য তার চেয়ে অনেক কম। প্রাচীন ঈজিপ্সীয় মূর্তিগুলোর মধ্যে যেমন চেহারা দেখা যায় পোর্ট সেইডের রাস্তাঘাটে আজকের দিনেও সেরকম চেহারা অনেক চোখে পড়ে। সুতরাং এতে অবাক হবার কিছুই নেই। ঈজিপ্সীয়দের মধ্যে ধরে নেওয়া যায় এটা একটা খুব টিপিক্যাল চেহারা।

মনে মনে ভাবলাম সেই পাগল বলেছিল—আমার পূর্বপুরুষের মৃতদেহ নিয়ে চলেছ তুমি ! বোধ হয় তার কথায় আমলটা তখন একটু বেশিই দিয়েছিলাম, তাই এখন আদল দেখে মনে একটা অমূলক আশঙ্কা জাগছে।

পোর্ট সেইডের স্মৃতি অগ্রাহ্য করে আমি ব্যান্ডেজ খোলার কাজে এগিয়ে চললাম। গলার কাছ থেকে ব্যান্ডেজটা সত্যিই পচা বলে মনে হতে লাগল। চিমটের প্রতি টানে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ ব্যাপারে অধৈর্য হলে মুশকিল—তাই অত্যন্ত ধীর ও শান্তভাবে চালাতে লাগলাম হাত।

সময় যে কীভাবে কেটে যাচ্ছে সে বোধ কাজের সময়ে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। পাঁজরের নীচটায় যখন পৌঁছেছি তখন খেয়াল হল যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বাতিটা জ্বালানো দরকার। চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাব—এমন সময় জানালার দিকে চোখ পড়তেই সর্বাঙ্গে যেন একটা শিহরন খেলে গেল।

জানালার কাচে মুখ লাগিয়ে ঘরের ভিতর একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে পোর্ট সেইডের সেই পাগল! তার চোখে মুখে আগের চেয়েও শতগুণ হিংস্র ও উন্মত্ত ভাব। সে একবার আমার দিকে ও একবার কফিনের দিকে চাইছে।

ঘরে আলো জ্বালালে হয়তো আতঙ্কের ভাবটা একটু কমবে এই মনে করে দেয়ালে সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় জানালার ছিটকিনিটা ভেঙে উপড়ে ফেলে লোকটা এক লাফে একেবারে আমার ল্যাবরেটরির মধ্যে এসে পড়ল! তারপর তার পৈশাচিক দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ করে হাতদুটোকে বাড়িয়ে আমার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

তার পরের ঘটনাটি ঠিক পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। কারণ সমস্ত জিনিসটা ঘটে গেল একটা বৈদ্যুতিক মুহূর্তের মধ্যে! লোকটাও আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ফ্যাঁস শব্দ করে নিউটন কোত্থেকে জানি এসে সোজা লাফিয়ে পড়ল লোকটার মুখের উপর।

তারপর একেবারে রক্তাক্ত ব্যাপার। পাগলের ডান গালে একটা বীভৎস আঁচড় দিয়ে নিউটন তাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলল। নিউটনের আক্রোশ আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল এই যে, লোকটা সেই যে রক্তাক্ত গাল নিয়ে মাটিতে পড়ল—সেই অবস্থা থেকে সে আর উঠতে পারল না। শক্ থেকে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ—এ ছাড়া তার এভাবে মৃত্যুর আমি কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না।

লোকটা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে নিউটন লেজ গুটিয়ে সুবোধ বালকটির মতো ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে চলে গেল, আর আমি একটা অসহ্য দুর্গন্ধ পেয়ে কফিনের দিকে চেয়ে দেখি চার হাজার বছরের পুরনো মৃতদেহে বিকারের লক্ষণ দেখা গেছে। এই পাগলটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঈজিপ্সীয়ান জাদুর মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে!

আমি আর দ্বিধা না করে কফিনের ডালাটা বন্ধ করে, ছত্রিশ রকম সুগন্ধ ফুলের নির্যাস মিশিয়ে আমার নিজের তৈরি এসেন্সের খানিকটা ল্যাবরেটরির চারিদিকে স্প্রে করে দিলাম।

মামির রহস্য রহস্যই রয়ে গেল এযাত্রা। প্রাচীন ঈজিপ্সীয় বৈজ্ঞানিক এই একটি ব্যাপারে এখনও ভারতের সেরা বৈজ্ঞানিকের এক ধাপ উপরে রয়ে গেলেন।

স্থানীয় পুলিশে খবর পাঠাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পড়ল। এখানকার ইনস্পেক্টর যতীন সমাদ্দার আমাকে খুবই সমীহ করেন। তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, 'ওই কাঠের বাক্সের মৃতদেহটির জন্য তো আর আপনি দায়ী নন। কিন্তু ওই যে মাটিতে যিনি পড়ে আছেন, তাঁর মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে একটু ঝক্কি পোয়াতে হবে।'

আমি বললাম, 'সে হোক। আপাতত আপনি এই প্রাচীন এবং নবীন লাশদুটোকেই এখান থেকে সরাবার বন্দোবস্ত করুন তো!'

www.BDeBooks.Com

৭ই অক্টোবর

আজ সামারটনের চিঠি পেয়েছি। লিখেছে, 'প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু, আশা করি নোবেল প্রাইজ পাবার পথে বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছ। তোমার কফিনের প্যাপাইরাসটার পাঠোদ্ধার করেছি। তাতে মৃত ব্যক্তির পরিচয় দিয়ে বলা হচ্ছে—'ইনি জীবদ্দশায় বেড়ালমুখি নেফ্‌দৎ দেবীর অবমাননা করেছিলেন বলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু সেই দণ্ড ভোগ করার আগেই একটি বেড়ালের আঁচড় খেয়ে রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ দেবী তাঁর অবতারের রূপ ধরে তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নিজেই নিয়েছিলেন। আশ্চর্য নয় কি? এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী হতে পারে সেটাও একবার ভেবে দেখতে পার। তোমার কাজ কেমন চলছে জানিও। আমি ইংলন্ডে ফিরে প্রাণপণে বিটল-মাহাত্ম্য প্রচার করেছি। ইতি ভবদীয় জেম্‌স্ সামারটন।'

সামারটনের চিঠিটা পড়ে ভাঁজ করে খামের ভিতর রাখতে যাব এমন সময় আমার পাৎলুনে নিউটনের গা ঘষা অনুভব করলাম। আমি সস্নেহে তাকে কোলে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হে মার্জার তুমিও কি নেফ্‌দেৎ দেবীর অবতার নাকি?'

নিউটন বলল, 'ম্যাও!'

সন্দেশ। বৈশাখ ১৩৭০

প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়

(বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু বেশ কয়েক বছর যাবৎ নিখোঁজ। তাঁর একটি ডায়রি কিছুদিন আগে আকস্মিকভাবে আমাদের হাতে আসে। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' নাম দিয়ে আমরা সন্দেশে ছাপিয়েছি। ইতিমধ্যে আমি অনেক অনুসন্ধান করে অবশেষে গিরিডিতে গিয়ে তাঁর বাড়ির সন্ধান পাই, এবং তাঁর কাগজপত্র, গবেষণার সরঞ্জাম সব কিছুরই হদিস পাই। কাগজপত্রের মধ্যে আরও একুশখানা ডায়রি পাওয়া গেছে। তার কয়েকটি পড়েছি, অন্যগুলো পড়ছি। প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। তার মধ্যে একটি নীচে দেওয়া হল। ভবিষ্যতে আরও দেওয়ার ইচ্ছে আছে।)

৭ই মে, শুক্রবার

নীলগিরির পাদদেশে একটি গুহার মধ্যে বসে পেট্রোম্যাক্সের আলোতে আমার ডায়রি লিখছি। গুহার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত এবড়োখেবড়ো পাথরের ঢিবি। গাছপালা বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না—তবে গুহার সামনেই রয়েছে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ।

আমাদের কাছেই, গুহার প্রায় অর্ধেকটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে হাড়ের স্তূপ—গত সতেরো দিনের অক্লান্ত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল। প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার সম্বন্ধে আমি যতদূর পড়াশুনা করেছি, তাতে মনে হয় এ জানোয়ার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এর আয়তন

বিশাল। পায়ের পাতা সাড়ে তিন ফুট। পাঁজরের মধ্যে দু'জন মানুষ অনায়াসে বাস করতে পারে। সামনের পা-দুটো কিন্তু ছোট—কতকটা যেন টিরানোসরাসের মতো। লেজ আছে—বেশ লম্বা ও মোটা। সবচেয়ে মজা হল—দুটো ছোট ছোট ডানারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—যদিও এত বড় শরীরে অতটুকু ডানায় ওড়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

হাড়গুলো সরিয়ে এনে একত্র করা ছিল রীতিমতো শ্রমসাধ্য ব্যাপার। স্থানীয় টোডারা অনেক সাহায্য করেছে। না হলে একা প্রহ্লাদের সাহায্যে আমি আর কতটুকুই বা করতে পারতাম ? অথচ বিরাট তোড়জোড় করে ঢাক পিটিয়ে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি বরাবরই নিরিবিলি কাজ করতে ভালবাসি। তা ছাড়া এ ব্যাপারে তো কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। নীলগিরির এদিকটায় প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড় থাকতে পারে এমন একটা ইঙ্গিত অবিশ্যি আগেই পেয়েছিলাম—কিন্তু এ সব ব্যাপারে তো নিশ্চয়তা বলে কিছুই নেই! অনেক বড় বড় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানও ব্যর্থ হয়েছে বলে শুনেছি।

এখানে বলা দরকার আমার হাড় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার উৎসটা কী ; কবে, কীভাবে এ নেশা আমাকে পেয়ে বসল। আমি আসলে বৈজ্ঞানিক—পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে আমার কারবার। সেখানে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে হঠাৎ এত মেতে উঠলাম কেন ?

এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমার জীবনে তিন বছর আগেকার ঘটনায় ফিরে যেতে হয়—যে ঘটনা আমার নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। আমি বিকেলে আমার বৈঠকখানায় বসে কফি খাচ্ছি, এমন সময় অবিনাশবাবু এসে হাজির। আমার গবেষণা নিয়ে অবিনাশবাবুর ঠাট্টাগুলো আমার মোটেই ধাতে সয় না কিন্তু আজ তাঁর মুখ বন্ধ করার মতো অস্ত্র আমার হাতে ছিল।

আমি আমার নতুন গাছের একটি ফল তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

অবিনাশবাবু সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললেন, 'ও বাবা—এমন ফল তো দেখিনি! গন্ধ আমের মতো—আবার ঠিক আমও নয়। আকারে গোল—কতকটা কমলার মতো অথচ একেবারে মসৃণ—দানাটানা কিচ্ছু নেই।'

আমি বললুম, 'ছুরি দিচ্ছি, কেটে খেয়ে দেখুন।'

অবিনাশবাবু এক কামড় খেয়েই একেবারে থ! বললেন, 'আহাহা—এ যে অতি উপাদেয় ফল মশাই! এ কি দিশি না বিলিতি ? পেলেন কোথায় ? এর নাম কী ?'

অবিনাশবাবুকে বাগানে নিয়ে গিয়ে আমার 'আমলা' বা Mangorange গাছ দেখিয়ে দিলাম। এ গাছ আমার গত এক বছরের সাধনার ফল। বললাম, 'এবারে দুটোর বেশি ফল মিক্স করে দেখছি। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টি—সব দিক দিয়েই আশ্চর্য নতুন সব ফল আবিষ্কার করার সম্ভাবনা রয়েছে।'

বৈঠকখানায় ফিরে এসে সোফায় বসতেই অবিনাশবাবু বললেন, 'এই দেখুন ফলের ঝামেলায় আসল কথাটাই বলা হয়নি—যেটা বলার জন্য আসা। শ্মশানটা পেরিয়ে একটা শিমুলগাছ আছে দেখেছেন তো ? সেইটেয় এক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছেন।'

'সেইটেয় মানে ? সেই গাছটায় ?'

'হ্যাঁ, গাছের ডাল ধরে ঝুলে যোগসাধনা করেন ইনি। পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকেন, হাত দুটোও ঝুলে থাকে। এইটেই নাকি এঁর অভ্যাস।'

'যত সব বুজরুকি।'

সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আমার ভক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এদের মধ্যে

www.BDeBooks.Com

বুজরুকের সংখ্যাই যে বেশি তার প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি।

অবিনাশবাবু কিন্তু আমার কথা শুনে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। আমার টেবিলটা চাপড়ে কফির পেয়ালাটাকে প্রায় ফেলে দিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না মশাই—বুজরুকি না। সাধুটির সঞ্জীবনীমন্ত্র জানা আছে।

'কী রকম ?'

'কী রকম আবার ? জন্তুজানোয়ারের কঙ্কাল এনে দিলে মন্ত্রের জোরে সেগুলোকে রক্ত-মাংস দিয়ে আবার জ্যান্ত করে ফেলেন ! প্রথম দিন একটা শেয়ালকে জ্যান্ত করেন। আমার চাকর বাঞ্ছারাম নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে এসে আমার কাছে রিপোর্ট করে। শুনেটুনে আমিও প্রথমটা তাকে একটু ধমকধামক দিয়ে বিকেলের দিকে আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে নিজেই গেসলুম। গিয়ে কী দেখলুম জানেন ? ননী ঘোষের একটা বাছুর বুঝি মাসখানেক আগে রেললাইনের ওদিকটায় চরতে গেসল। সেইখানেই সাপের কামড়টামড় খেয়ে ওটা বুঝি মরে পড়েছিল। শকুনিতে তার মাংস খেয়ে হাড়টুকু রেখে গেসল। এক রাখাল ছোকরা সেই হাড় দেখতে পায়। সাধুবাবার কীর্তির কথা শুনে দেখি হাড়গুলো এনে গাছের তলায় রেখেছে। আর সাধুবাবা সেই ঝোলা অবস্থাতেই দেখি হাড়ের স্তূপের দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে আর চোখ পাকাচ্ছে। তারপর দেখি বাঁ হাতটা তুলে সটান পশ্চিম দিকে পয়েন্ট করে ডান হাতটা নীচের দিকে বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে মুখ দিয়ে কী জানি বিড়বিড় করছে। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই—চোখের সামনে দেখলুম সে হাড়ের উপর কোত্থেকে মাংস চামড়া লোম খুর সব লেগে গিয়ে বাছুরটা যেন ঘুম ভেঙে তড়াক করে উঠে হাম্বা হাম্বা বলে দে ছুট ! বড় বড় ম্যাজিশিয়ান শুনেছি একসঙ্গে অনেকগুলো লোককে হিপনোটাইজ করতে পারে। কিন্তু এখানে তাই বা হয় কী করে ? এই তো আসবার সময়ও দেখে এলাম সেই বাছুরকে—দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। তাই ভাবলুম, আপনার তো এ সব ব্যাপারে বিশ্বেসটিশ্বেস নেই—আপনাকে যদি একবার দেখিয়ে আনতে পারি, বেশ রগড় হয় ! যাবেন নাকি একবার শ্মশানের দিকটায় ?'

অবিনাশবাবু মিথ্যে বলছেন কি না সেটা ওঁর সঙ্গে না গিয়ে বোঝার কোনও উপায় নেই। ভেবে দেখলাম, মিথ্যে হলে বড় জোর ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হবে। যাই না ঘুরে আসি !

উশ্রীর ধারে শ্মশান পেরিয়ে যখন শিমুলগাছটার কাছে পৌঁছলাম তখন সূর্য ডুবতে আর মিনিট পনেরো বাকি।

সাধুবাবার চেহারা যে ঠিক এমনটি হবে তা আমি অনুমান করিনি। গায়ের রং মিশকালো, লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, চুল দাড়ি কাঁচা এবং ঘন, বয়স বোঝার কোনও উপায় নেই। শিমুলগাছের ডালে পা দিয়ে যেভাবে ঝুলে আছেন সাধুবাবা, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেভাবে বেশিক্ষণ থাকলে মাথায় রক্ত উঠে মৃত্যু অনিবার্য। অথচ এই লোকটির চেহারায় অসোয়াস্তির কোনও লক্ষণ নেই। বরং ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসির ভাব রয়েছে বলেই মনে হল।

সাধুটিকে ঘিরে জনা পঞ্চাশেক লোকের ভিড়। বোধহয় হাড়ের খেলার তোড়জোড় চলেছে।

অবিনাশবাবু ভিড় ঠেলে আমাকে সঙ্গে করে এগিয়ে গেলেন। এবারে দেখতে পেলাম, সাধুটির মাথার ঠিক নীচেই বেড়ালের সাইজের কোনও জানোয়ারের হাড় স্তূপ করে রাখা হয়েছে। সাধু তাঁর দু'হাত একত্র করে দশটি আঙুল সেই হাড়ের দিকে তাগ করে রেখেছেন। হঠাৎ এক বিরাট হুংকার দিয়ে সাধুবাবা দুলতে আরম্ভ করলেন—তাঁর দৃষ্টি হাড়ের স্তূপের উপর নিবদ্ধ। অবিনাশবাবু আমার কোটের আস্তিনটা চেপে ধরলেন।

এখানে বলে রাখি—হিপনোটিজম নিয়ে বিস্তর গবেষণা আমি এককালে করেছি, এবং এ

কথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে এমন কোনও জাদুকর পৃথিবীতে নেই যে আমায় হিপনোটাইজ করতে পারে। ওয়ালি, ম্যাক্সিম দি গ্রেট, ফ্যাবুলিনো, জন শ্যামরক ইত্যাদি পৃথিবীর সেরা সব জাদুকর নানান কৌশল করেও আমাকে হিপনোটাইজ করতে পারেনি। বরং উলটে একবার তো সেই চেষ্টায় রাশিয়ান জাদুকর জেবুলস্কি নিজেই ভিরমি গেলেন। যাই হোক, আসল কথা হল—সাধুবাবা যদি সম্মোহনের আশ্রয় নেন, তা হলে আমার কাছে এঁর বুজরুকি ধরা পড়তে বাধ্য।

মিনিটখানেক দোলার পর সাধুবাবা স্থির হলেন। তারপর লক্ষ করলাম সাধুবাবার সমস্ত শরীরে একটা কম্পন আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু সে কম্পন এতই মৃদু যে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তা ধরাই পড়বে না।

এবার হাড়গুলোর দিকে চাইতে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম। হাড়গুলির মধ্যেও যেন একটা অতি অল্প, কিন্তু অতি দ্রুত স্পন্দনের লক্ষণ এবং সেই স্পন্দনের ফলে হাড়ে হাড় লেগে একটা অতি মিহি খট খট শব্দ,—শীতকালে দাঁতে দাঁত লেগে যেমন শব্দ হয় কতকটা সেই রকম।

আমি অবিনাশবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, 'লোকটা মন্তর-টন্তর আওড়ায় না।'

অবিনাশবাবু ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে বললেন, 'সবুর করুন—মেওয়া ফলবে এক্ষুনি।'

এক্ষুনি না হলেও, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না! নদীর ওপারের জঙ্গল থেকে সবেমাত্র শেয়াল ডেকে উঠেছে, এমন সময় দেখি সাধুবাবা তাঁর বাঁ হাতটা উঁচিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে নির্দেশ করছেন। আর ডান হাত বাঁই বাঁই করে ইলেকট্রিক পাখার মতো ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন। তারপর আরম্ভ হল মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ। এটাই যদি সঞ্জীবনীমন্ত্র হয় তা হলে অবিশ্যি তা অনুধাবন করা মানুষের অসাধ্য। গ্রামোফোনের স্পিড অসম্ভব বাড়িয়ে দিলে সুর যেমন চড়ে যায়, আর কথা যেমন দ্রুত হয়ে যায় এ যেন সেই রকম ব্যাপার। এত তীক্ষ্ণ উঁচু স্বর আর এমন দ্রুত বিড়বিড়োনি যে মানুষের পক্ষে সম্ভব তা জানতাম না।

আবার চোখ গেল হাড়গুলোর দিকে।

আমি বৈজ্ঞানিক। এর পর চোখের সামনে যা ঘটল তার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না জানি না। হয়তো আছে। হয়তো আমাদের বিজ্ঞান এখনও এ সবের কূলকিনারা করতে পারেনি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো পারবে। কিন্তু যা দেখলাম তা এতই জলজ্যান্ত পরিষ্কার যে সেটা অবিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

যা ছিল আলগা কতগুলো হাড়, তা এক নিমেষে প্রথমে জায়গায় জায়গায় জোড়া লেগে গেল—অর্থাৎ মাথার জায়গায় মাথা, পাঁজরের জায়গায় পাঁজর, পায়ের জায়গায় পা, ইত্যাদি, এবং তার উপর দেখতে দেখতে এল মাংস রক্ত স্নায়ু ধমনী চামড়া লোম নখ চোখ এবং সবশেষে—প্রাণ আর প্রাণ আসার সঙ্গে সঙ্গেই হাড়ের জায়গায় একটি ফুটফুটে সাদা খরগোশ মিটমিট করে এদিক ওদিক চেয়ে কান দুটোকে বার কয়েক নাড়া দিয়ে এক লাফে লোকজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!...

গভীর চিন্তা ও বিস্ময় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। অবিনাশবাবুর কাছে এই প্রথম আমায় নতি স্বীকার করতে হল। আমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার আগে ভদ্রলোক বেশ শ্লেষের সঙ্গেই বললেন, 'পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় তো দেখলাম মশাই। বিশ বছর ধরে অ্যাসিড ম্যাসিড ঘেঁটে হাতটাত পুড়িয়ে তো বিস্তর নাজেহাল হলেন। এইসব ছেলেখেলা বন্ধ করে আমার সঙ্গে আলুর চাষে নেমে পড়ুন।'

www.BDeBooks.Com

পরের দিন দেখলাম আমার নিজের কাজে মন বসছে না। মন চলে যাচ্ছে বার বার ওই শ্মশানঘাটে শিমুলগাছের দিকে। দু'দিন কোনও রকমে নিজেকে সামলে রেখে তৃতীয় দিনের দিন চলে গেলাম আবার সাধুদর্শনে। তার পরের দিনও আবার গেলাম। প্রথম দিনে কুকুর ও দ্বিতীয় দিনে একটি চন্দনাকে কঙ্কাল অবস্থা থেকে পুনর্জীবন পেতে দেখলাম। কুকুরটা নাকি পাগল হয়ে মরেছিল—জ্যান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মোতি ধোপার পায়ে এক কামড় বসিয়ে দিল। আর চন্দনাটা সটান শিমুলগাছের মগডালে উঠে 'রাধাকিষণ' 'রাধাকিষণ' বলে ডাকতে আরম্ভ করল।

আমি অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম।

আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মন্ত্রটার কোনও কূলকিনারা করতে পারলাম না ; অথচ ওদিকে দন্তস্ফুট করে বিশ্লেষণ করলে হয়তো রহস্যের কিছুটা সমাধান হতে পারত।

পরের দিন বিকেলের দিকে ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় এক ফন্দি এল যেটার চমৎকারিত্ব আমি নিজেই তারিফ না করে পারলাম না।

আমার তো রেকর্ডিং যন্ত্র রয়েছে, এই দিয়ে কোনওরকমে লুকিয়ে মন্ত্রটাকে রেকর্ড করে রাখা যায় না ? আলবত যায়, এবং সেটা করতে হবে এক্ষুনি। শুভস্য শীঘ্রম্। সাধুবাবা কোনদিন অন্তর্ধান হবেন তার কি ঠিক আছে ?

পরদিন অমাবস্যা। আমার রেকর্ডিং যন্ত্রের মাইক্রোফোনটি আকারে একটি দেশলাইয়ের বাক্সের মতো। তার সঙ্গে একটা লম্বা তার জুড়ে মাঝরাত্রে গেলাম শ্মশানঘাটে শিমুলগাছের কাছে।

গিয়ে দেখি সাধুবাবার খ্যাতি এমনই ছড়িয়েছে যে এত রাত্রেও জনা ত্রিশেক লোক গাছটার নীচে অর্থাৎ সাধুবাবার নীচে জটলা করে রয়েছে। এতে এক দিক দিয়ে আমার কাজের সুবিধেই হল। আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গাছের গুঁড়িটাকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করার ভাব করে এক ফাঁকে টুক করে গুঁড়ির একটা ফাটলের ভিতর মাইক্রোফোনটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর তারের অন্য মুখটা গাছ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে একটা কেয়াঝোপের পিছনে লুকিয়ে রেখে দিলাম।

পরদিন হনুমান মিশ্রর একটা ছাগল জ্যান্ত করার সময় আমার যন্ত্রে সাধুবাবার মন্ত্রটি রেকর্ড হয়ে গেল।

যন্ত্রটি হাতে নিয়ে সন্ধের দিকে যখন চোরের মতো বাড়ি ফিরলাম তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রহ্লাদকে গরম কফি বানানোর আদেশ দিয়ে আমি আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলাম। দু'-এক ঝলক বিদ্যুতের চমক ও কিছু মেঘগর্জনের পর বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠল। আমি জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে রেকর্ডারটা টেবিলের উপর রেখে তারটা দেওয়ালের প্লাগে লাগিয়ে দিলাম। আমার মতলব ছিল, প্রথমে সাধারণ স্পিডে মন্ত্রটা বার কয়েক শুনে তারপর অর্ধেক স্পিডে সেটাকে চালাব। তা হলেই মন্ত্রটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে। বিজ্ঞানের কাছে এইখানেই ত্রিকালজ্ঞ সাধুবাবাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

সদ্য আনা গরম কফিতে একটা চুমুক দিয়ে রেকর্ডারের সুইচটা টিপে দিতেই বাদামি রঙের ম্যাগনেটিক টেপ ঘুরতে আরম্ভ করল। 'বলো হরি হরিবোল'। মনে পড়ল সাধুবাবার মন্ত্রোচ্চারণের কিছু আগেই একটি মড়া এসে পৌঁছেছিল শ্মশানঘাটে। এ তারই শব্দ।

তারপর এল শেয়ালের ডাক। তারপর এই সেই তক্ষকের ডাক। এইবার শুনব সেই মন্ত্র।

এই তো সেই তীক্ষ্ণ স্বর, সেই বিদ্যুদ্বেগে বিড়বিড়োনি—ঠিক কানে যেমনটি শুনেছি—অবিকল সেই রকম।

কিন্তু এ কী ? যন্ত্র হঠাৎ থেমে গেল কেন !

আর এই বিকট অট্টহাসি কার ? এ তো আমার রেকর্ড করা কোনও হাসির শব্দ নয়। এ যে আমার ঘরের পাশেই...

আমার চোখ চলে গেল পুবের জানালার দিকে। জানালার বাইরে আমার বাগান এবং বাগানে গোলঞ্চগাছ।

বিদ্যুতের এক ঝলক আলোয় দেখলাম সেই গোলঞ্চগাছের ডাল থেকে ঝুলে আছে শ্মশানের সেই সাধুবাবা—তাঁর হিংস্র দৃষ্টি আমার রেকর্ডার যন্ত্রের উপর নিবদ্ধ।

ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অস্বাভাবিক মনে হল যে আমি ভয় না পেয়ে সোজা জানালার কাছে গিয়ে সেটাকে এক ঠেলায় খুলে দিলাম।

কিন্তু কোথায় সে সাধুবাবা ? গাছ রয়েছে, গাছের পাতা বৃষ্টির জলে চিক চিক করছে কিন্তু সাধুবাবা উধাও, অদৃশ্য।

ভুল দেখলাম নাকি ?

কিন্তু চোখ, কান দুইই একসঙ্গে এমন ভুল করতে পারে! হাসিও যে শুনলাম সাধুবাবার—গলার স্বর তো চেনা হয়ে গেছে এই তিন দিনে।

যাকগে—ভেলকিই হোক আর সত্যিই হোক, চলেই যখন গেছে তখন আর ভেবে লাভ কী ? তার চেয়ে বরং যন্ত্রটা চালানোর চেষ্টা করা যাক।

আশ্চর্য—এবার সুইচ টিপতেই দেখি যন্ত্র চলছে। কিন্তু শ্মশানের সেই শব্দ কোথায় গেল ?

মন্ত্রের বদলে এই বিকট হাসি রেকর্ড হয়ে গেল কী করে ?

বাধ্য হয়েই মনে মনে স্বীকার করতে হল যে কোনও অলৌকিক শক্তির বলে সাধুবাবাজি আমার গোপন অভিসন্ধির কথা টের পেয়ে প্রচেষ্টা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন।

সঞ্জীবনীমন্ত্রটি আয়ত্ত করার আর কোনও উপায় নেই।

পরদিন অবিনাশবাবু এসে বললেন, 'শিমুলগাছে টু-লেট টাঙানো রয়েছে দেখে এলুম। সাধুবাবা পগার পার।'

যেমন আকস্মিকভাবে এসেছিলেন, তেমনই আকস্মিকভাবে চলে গেছেন সাধুবাবা। রেখে গেছেন শুধু তাঁর বিকট হাসি আর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত কিছু পাখি আর জানোয়ার।

আরেকটি জিনিসকে সাধুবাবার দান বলেই বলব—সেটা হল হাড় সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা। হাড়ের নেশা এর পর থেকেই আমাকে পেয়ে বসে। আমার বাড়ির যে ঘরটা খালি পড়ে ছিল কয়েকমাসের মধ্যেই নানান পশুপক্ষীর কঙ্কাল দিয়ে সেটা ভরাট হয়ে যায়। হাড় সম্বন্ধে যা কিছু পড়ার তা পড়ে ফেলি। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার সবের মধ্যেই যে একটা অস্থিগত সাদৃশ্য আছে তা জেনে একটা অদ্ভুত মনোভাব হয় আমার। যাবতীয় প্রাণীর কঙ্কালের প্রতি একটা বিচিত্র আকর্ষণ আমি অনুভব করতে থাকি। এক রকম চশমাও আমি আবিষ্কার করি যার মধ্য দিয়ে দেখলে জীবন্ত প্রাণীর রক্তমাংস না দেখে কেবল তার কঙ্কালটাই দেখতে পাওয়া যায়।

এই হাড় থেকেই জাগে প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার সম্পর্কে কৌতূহল। অবিশ্যি এই দুই-এর মাঝখানে রয়েছেন শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গম দেশিকাচার শেষাদ্রি আয়াঙ্গার বা সংক্ষেপে মিস্টার আয়াঙ্গার। ব্যাঙ্গালোরবাসী অমায়িক যুবক-ব্রাহ্মণ। আমার সঙ্গে আলাপ উশ্রীর ধারে। বেশ লাগল ভদ্রলোকটিকে। গণিতজ্ঞ পণ্ডিত লোক—তাই কথা বলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।

www.BDeBooks.Com

তাঁর বাড়িতেই একদিন বিকেলে চা খেতে গিয়ে বৈঠকখানায় দেখলাম এক অতিকায় গোড়ালি অর্থাৎ কোনও অতিকায় জানোয়ারের গোড়ালির হাড়।

হাড়টা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'নীলগিরিতে এক বন্ধুর চা-বাগানে ছুটিতে গিয়েছিলাম। কাছাকাছি পাহাড়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওই হাড়টা পাই। হাতি না গণ্ডার ? বলুন তো কীসের হাড় ?'

মুখে বললুম, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।' মনে মনে বললুম তুমি গণিতজ্ঞ হতে পারো কিন্তু অস্থিবিদ নও! এ হাড় হাতিরও নয়, গণ্ডারেরও নয়! এ হাড় যে জানোয়ারের, সে জানোয়ারের অস্তিত্ব অন্তত কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে।

আমি নিজে বুঝেছিলাম—হাড়টা ব্রন্টোসরাসের এবং তখনই মনে মনে স্থির করেছিলুম—নীলগিরিতে একটা পাড়ি দিতেই হবে।

সেইদিন থেকে তোড়জোড় শুরু করে আজ তিন সপ্তাহ হল আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। আশ্চর্য সৌভাগ্যক্রমে, আমরা আসার চার দিন পরেই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড়ের সন্ধান পেয়েছি এই গুহার মধ্যে। টুকরো ইতস্তত ছড়ানো হাড় এক জায়গায় স্তূপ করে রাখতে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছে। সত্যি বলতে কী, স্থানীয় টোডাদের সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে এ কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হত না।

আগেই বলেছি, এ জানোয়ার আমার অপরিচিত। শুধু আমার কেন, প্রাণিবিদ্যার জগতে এ জানোয়ারের পরিচয় কেউ জানে বলে আমার মনে হয় না। আমি স্থির করেছি আর দু'-এক দিনের মধ্যেই ব্যাঙ্গালোরে আমার আবিষ্কারের কথা জানিয়ে দেব। আমার একার পক্ষে এ হাড় স্থানান্তরিত করা অসম্ভব।

মাসখানেকের মধ্যেই কলকাতা কি মাদ্রাজের জাদুঘরে একটি নাম না-জানা প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কালের স্থান হলে মন্দ হয় না। ...

ব্যাঙ্গালোর স্টেশনের ওয়েটিং রুম-এ বসে আমার ডায়রি লিখছি। গতকালের ঘটনাটার একটা যথার্থ বর্ণনা দেওয়া বৈজ্ঞানিকের চেয়ে সাহিত্যিকের পক্ষেই বোধহয় সহজ বেশি। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, অনেক বিপদ, অনেক বিভীষিকা আমার জীবনে দাগ রেখে গেছে, কিন্তু কালকের ঘটনার যেন কোনও তুলনা নেই।

কাল বিকেল অবধি আমার কাজ ছিল হাড়গুলোকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করা। এই আদ্যিকালের ধুলো ঝাড়া কি আর এক নিমেষের কাজ—এক-একটি অংশ পরিষ্কার করছি এবং সেইগুলো আমার টোডা অ্যাসিসট্যান্টদের সাহায্যে যথাস্থানে বসাচ্ছি। জন্তুর চেহারাটা যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে আসছে।

সন্ধ্যা হবার মুখটাতে টোডারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। প্রহ্লাদকে পাঠিয়ে দিলাম সবজির সন্ধানে।

আমি একা গুহার ভিতরে রয়েছি। এই বার পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালাবার সময় হয়েছে। গুহার বাইরের অশ্বত্থগাছে পাখির কলরব থেমে গিয়ে চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব।

দেশলাইটা জ্বালাতে হঠাৎ যেন একটা খচমচ শব্দ শুনতে পেলাম। গিরগিটি বা গোসাপ জাতীয় কিছু হবে আর কী। কিন্তু টর্চের আলোতে কিছুই চোখে পড়ল না।

পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালিয়ে একটা চ্যাটালো পাথরের উপর রাখতেই গুহার ভিতরটা বেশ আলো হয়ে উঠল।

সেই আলোয় হাড়গুলোর দিকে চোখ পড়তেই মনে হল সেগুলো যেন অল্প অল্প কাঁপছে।

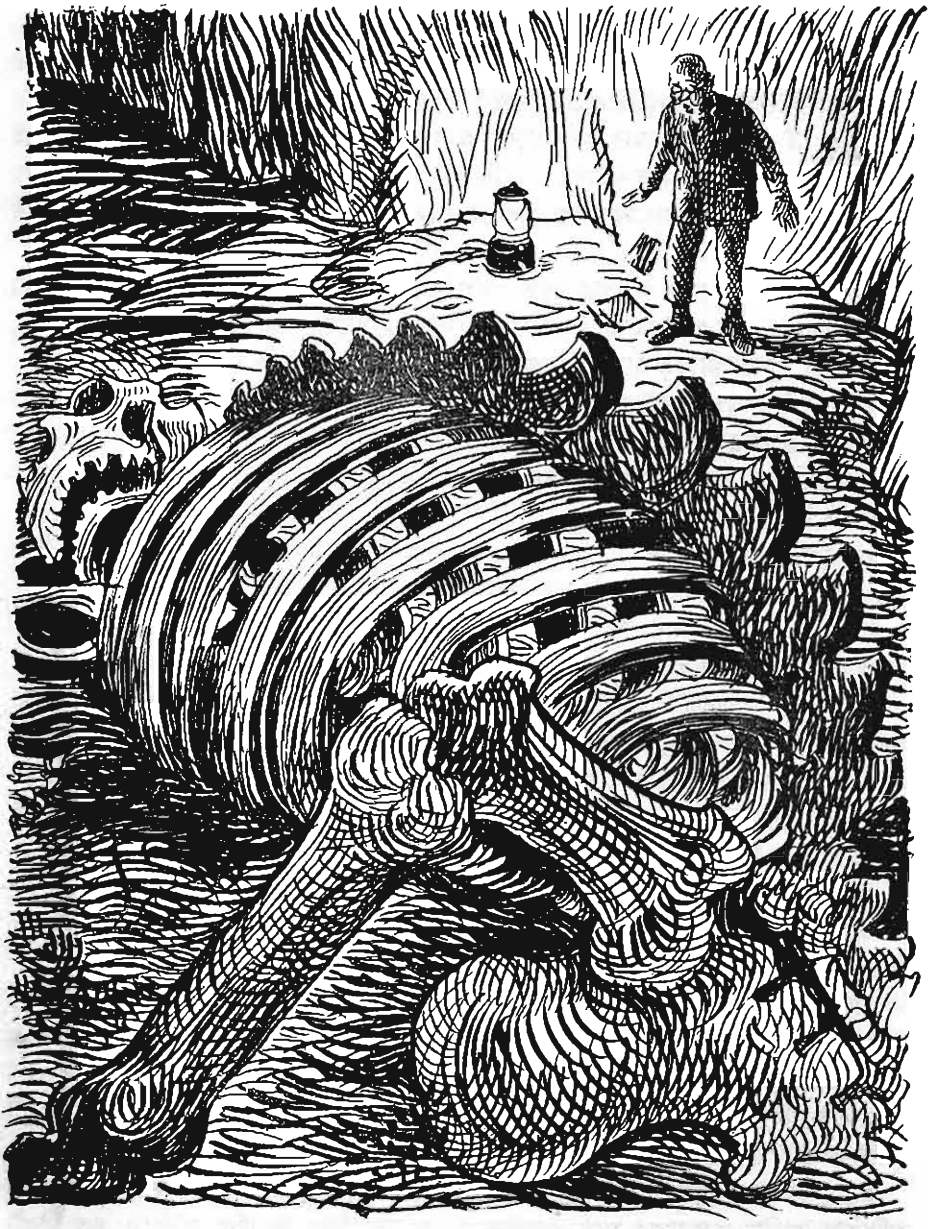

এটা অনুভব করতেই তিন বছর আগেকার শিমুলগাছের সেই স্মৃতি আমার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়ে দিল এবং আমার চোখ চলে গেল গুহার মুখের দিকে।

বাইরে অশ্বত্থগাছের ডাল ধরে ঝুলে আছে সেই সাধুবাবা।

তাঁর বাঁ হাত পশ্চিম দিকে তোলা ডান হাত বন বন করে ঘুরছে, দৃষ্টি বিস্ফারিত, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে জ্বলজ্বল চোখ করে চেয়ে আছে আমারই দিকে।

তারপরই আরম্ভ হল তীক্ষ্ণ ক্ষীণ স্বরে অতি দ্রুত লয়ে সেই অদ্ভুত অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণ।

কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করেই আমার দৃষ্টি সাধুর দিক থেকে ঘুরিয়ে দিল ওই

www.BDeBooks.Com

প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড়ের স্তূপের দিকে।

হাড় এখন আর হাড় নেই। তার জায়গায় এক অদৃষ্টপূর্ব অতিকায় আদিম প্রাণী সাধুবাবার অলৌকিক শক্তির বলে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আমি এই বিপদেও আমার হাতিয়ারের কথা ভুলে গিয়ে যে পাথরে বসেছিলাম, সেই পাথরেই পাথরের মতো বসে রইলাম। অন্তিমকালে ইষ্টনাম জপ করার চিন্তাও আমার মাথায় আসেনি। এ কথাই কেবল মনে হয়েছিল যে এমন দৃশ্য দেখে মরার সৌভাগ্য আর বোধহয় কারও হয়নি।

প্রাণের স্পন্দন আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি জানোয়ারটির আকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিলাম। এত পরিশ্রম করে অতীতের যে জানোয়ারের কঙ্কালের আবিষ্কর্তা এই আমি, সেই কঙ্কাল, পুনরুজ্জীবিত হয়ে কি শেষটায় আমাকেই ভক্ষণ করবে?

গুহার বাইরে অশ্বত্থগাছটার দিকে একটা দ্রুত দৃষ্টি দিয়ে বুঝলাম সাধুবাবার চোখেমুখে এক পৈশাচিক উল্লাসের ভাব। আমি এককালে আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে তাঁর মন্ত্র অপহরণের চেষ্টা করেছিলাম এবং অনেকদূর সফলও হয়েছিলাম। সাধুবাবা আজ সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত।

এক বিশাল গর্জন গুহার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে দিল। বুঝলাম জানোয়ারের দেহে প্রাণ এসেছে।

ক্রমশ সেই পর্বতপ্রমাণ দেহ তার পিছনের দু' পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল। একজোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ কিছুক্ষণ আমার পেট্রোম্যাক্সের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর দেখি জন্তুটা এগোতে শুরু করেছে। তার উত্তপ্ত নিশ্বাস আমি আমার দেহে অনুভব করছি। একটা মৃদু অথচ গুরুগম্ভীর গর্জন ও লেজের দু-একটা আছড়ানিতে অনুমান করলাম জানোয়ার কোনও কারণে বিচলিত—হয়তো বিক্ষুব্ধ।

তারপর দেখলাম জানোয়ারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গুহার বাইরে অশ্বত্থগাছটার উপর এবং পরমুহূর্তেই সে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পরের দৃশ্য আমার জীবনের শেষদিন অবধি মনে থাকবে।

জানোয়ারটা সোজা গিয়ে অশ্বত্থগাছের একটা ডাল ধরে পাতা সমেত সেটাকে মুখে পুরে দিল।

আর সাধুবাবা? তাঁর যে অন্তিম অবস্থা উপস্থিত সেটা কি তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন? আর তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে যে তিনি তাঁর শেষ ভেলকি দেখিয়ে যাবেন, সেটা কি আমি জানতাম? জানোয়ারটা যখন ডাল ধরে নাড়া দিচ্ছে তখনই লক্ষ করছিলাম যে সাধুবাবার প্রায় ডালচ্যুত হবার উপক্রম। কিন্তু সেই অবস্থাতেই দেখলাম তিনি তাঁর বাঁ হাতটি পূর্বদিকে তুলে ডান হাত বন্‌বন্‌ করে ঘুরিয়ে আরেকটা কী যেন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন।

মন্ত্র শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবা গাছ থেকে মাটিতে পড়লেন এবং পরমুহূর্তেই সেই অতিকায় আদিম জানোয়ার মুখে একগুচ্ছ অশ্বত্থপাতা নিয়ে চতুর্দিক কাঁপিয়ে এক বিরাট আর্তনাদ করে কাত হয়ে পড়ল সাধুবাবার উপরেই!

তারপর দেখলাম এতদিন যা দেখেছি তার বিপরীত জাদু। একটি আস্ত রক্তমাংসের জানোয়ার চোখের সামনে আবার অস্থির স্তূপে রূপান্তরিত হল। আর সেই বিরাট কঙ্কালের পাঁজরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম এক নরকঙ্কাল। সাধুবাবার মৃতদেহ জানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে।

আপনা থেকেই আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হল। রাখে কেষ্ট মারে কে? এই জানোয়ার উদ্ভিদ্‌জীবী এবং পুনর্জীবনলাভের পরমুহূর্তে সে অত্যন্ত

ক্ষুধার্ত ছিল বলেই সামনে আর কিছু না পেয়ে অশ্বত্থের পাতায় ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করছে। মাংসাশী হলে জানোয়ার প্রথমে আমাকেই খেত এবং তার পরেই সাধুবাবা উলটো মন্ত্র উচ্চারণ করে জানোয়ারকে আবার অস্থিতে পরিণত করে তাঁর প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করে অন্য কোনও গাছে গিয়ে আশ্রয় নিতেন।

একেই কি বলে হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা—

প্রহ্লাদ চা এনেছে। ট্রেনও বুঝি এসে গেল। এখানেই আমার লেখা শেষ করি।

সন্দেশ। পৌষ ১৩৭০

প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও

৭ই জুন

বেশ কিছুদিন থেকেই আমার মন মেজাজ ভাল যাচ্ছিল না। আজ সকালে একটা আশ্চর্য ঘটনার ফলে আবার বেশ উৎফুল্ল বোধ করছি।

আগে মেজাজ খারাপ হবার কারণটা বলি। প্রোফেসর গজানন তরফদার বলে এক বৈজ্ঞানিক কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক যাবেন হাজারিবাগ। আমার নাম শুনে, আমার বইটই পড়ে এসেছিলেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে এবং আমার ল্যাবরেটরিটা দেখতে। এর আগে অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক যে আসেননি তা নয়। প্রায় সব দেশের বৈজ্ঞানিকেরাই ভারতবর্ষে এলে একবার আমার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে দেখে যান। এক নরউইজীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ তো প্রায় এক মাস কাটিয়ে গিয়েছিলেন আমার এখানে। কিন্তু এ লোকটি যেন একটু অন্যরকম। এঁর হাবভাব যেন কেমন কেমন। বড্ড বেশি খুঁটিনাটি প্রশ্ন এবং চাহনিতে এমন একটা চঞ্চল ও তীব্র ভাব, যেন দৃষ্টি দিয়েই আমার গবেষণার সব কিছু রহস্য আয়ত্ত করে ফেলবেন। মৌলিক গবেষণা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটু রেষারেষি থাকতে বাধ্য। আমি যে সব তথ্য বছরের পর বছর চিন্তা করে, অঙ্ক কষে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবিষ্কার করেছি, তা কেউ এক প্রশ্নের জবাবেই সব জেনে ফেলবে এটা আশা করাটাই তো অন্যায়! অথচ ভদ্রলোকের যেন সে রকমই একটা মতলব। আমার চেহারা দেখে আমাকে বোধহয় নিরীহ গোবেচারা বলেই মনে হয়। নইলে সরাসরি এ সব প্রশ্ন করার সাহস হয় কী করে? আর প্রশ্ন করলেও তার জবাব পাবার আশা করে কী করে?

আমি আবার সে সময়টা একটা আশ্চর্য ওষুধ নিয়ে গবেষণা করছিলাম। সে ওষুধটা খেলে যে কোনও প্রাণী অদৃশ্য হয়ে যাবে। ওষুধে পুরো কাজ তখনও দিচ্ছিল না। যে গিনিপিগটার উপর পরীক্ষা করছিলাম, সেটা ওষুধ খাবার পর ঠিক সতেরো সেকেন্ডের জন্য একটা স্বচ্ছ ঝাপসা চেহারা নিচ্ছিল, সম্পূর্ণ অদৃশ্য হচ্ছিল না। কোনও উপাদানে একটু গণ্ডগোল ছিল এবং সেই কারণেই আমার মনটা উদ্বিগ্ন ছিল। আর সেই সময়ে এলেন তরফদার মশাই।

www.BDeBooks.Com

তাঁর প্রশ্নবাণের ঠেলা সামলাতে সেদিন আমার রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল। আর সে কী বেয়াড়া রকমের কৌতূহল! আর ওষুধপত্রের বোতল হাতে নিয়ে ছিপি খুলে শুঁকে না দেখা অবধি যেন তাঁর শান্তি নেই। তবে একটা জিনিস টের পেয়ে বেশ মজা লাগছিল। আমার নিজের তৈরি ওষুধের প্রায় একটিও প্রোফেসর তরফদার চিনে উঠতে পারছিলেন না। অর্থাৎ সেগুলো কী কী জিনিস মিশিয়ে যে তৈরি হয়েছিল, তা তিনি মোটেই আন্দাজ করতে পারছিলেন না।

আমি অবিশ্যি আমার খাতাপত্রগুলো তাঁকে ঘাঁটতে দিইনি। অর্থাৎ তার মধ্যেই অদৃশ্য হবার ওষুধের ফরমুলা এবং সেই সম্বন্ধে আমার গবেষণার যাবতীয় নোট ছিল। সেই খাতাটা আমি সব সময়ে চোখে চোখে রাখছিলাম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা রেজিস্টারি চিঠি এসে পড়াতে এবং আমার চাকর প্রহ্লাদ বাড়িতে না থাকাতে, আমাকে দু' মিনিটের জন্য উঠে বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে দেখি তরফদার খাতাটা খুলে আমার লেখা গোগ্রাসে গিলছেন, তাঁর হাবভাবে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা।

আমি তাঁর হাত থেকে খাতাটা ছিনিয়ে নেবার অভদ্রতাটা করতে পারলাম না। কিন্তু তার পরিবর্তে বাধ্য হয়েই একটা মিথ্যের আশ্রয় আমাকে নিতে হল। বললাম, 'দেখুন, আমি এই মাত্র একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে একটা বড় দুঃসংবাদ রয়েছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন—আজ আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না।'

এর পরে আরও দু'দিন এসেছিলেন প্রোফেসর তরফদার কিন্তু আমার ল্যাবরেটরিতে তাঁর প্রবেশ করা হয়নি। কারণ তিনি এসেছেন জেনেই আমি ল্যাবরেটরিতে তালা লাগিয়ে তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়েছি। ফলে দু'বারই ভদ্রলোক চা খেয়ে পাঁচমিনিট উশখুশ করে আজেবাজে বকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

তারপর কবে যে তিনি হাজারিবাগ ফিরে গেছেন জানি না। এই ক'দিন আগে বুধবার তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। এ চিঠির মর্ম আমার মোটেই ভাল লাগেনি। তরফদার আমার গবেষণা সম্পর্কে একটা চাপা বিদ্রূপের সুরে লিখছেন যে তিনি আমার কাজে মোটেই ইম্‌প্রেস্‌ড্‌ হননি এবং তিনি নিজেই একটি অদৃশ্য হবার আশ্চর্য উপায় আবিষ্কার করতে চলেছেন, আমার আবিষ্কারের চেয়ে তার মূল্য নাকি অনেক বেশি। অল্পদিনের মধ্যেই নাকি তিনি এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করে আমাকে টেক্কা দেবেন।

আমি চিঠিটা পড়ে প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ একটা খটকা লাগল। যে দু' মিনিট তরফদার আমার খাতা খুলে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনি কি আমার ফরমুলা সব কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন নাকি? এবং সেটার ভিত্তিতেই কি তিনি নিজে কাজ করে খোদার উপর খোদকারি করতে চলেছেন? না, অসম্ভব। তরফদারের এমন ক্ষমতা আছে বলে আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না বরং তাঁকে আমার মোটামুটি সাধারণ স্তরের বৈজ্ঞানিক বলেই মনে হয়েছিল। তবুও চিঠিটা পড়ে আমার মেজাজটা কেমন জানি তেতো হয়ে গিয়েছিল।

এমন সময়ে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা এবং সেটা ঘটেছে আজই সকালে।

ভোর সাড়ে ছ'টায় উশ্রীর ধারে বেড়িয়ে এসে অভ্যাসমতো আমার বাগানের ফুলগাছগুলো দেখতে গিয়েছি এমন সময়ে পুব দিকের দেয়ালের ধারে গোলঞ্চগাছটার দিকে চাইতেই দেখি গাছটার একটা ডালে চোখ-ঝলসানো রঙের খেলা।

কাছে গিয়ে দেখি এক অতিকায় আশ্চর্য সুন্দর ম্যাকাও (Macaw বা Macao) পাখি গাছটার একটা ডালে বসে আমার দিকে চেয়ে আছে। ম্যাকাও কাকাতুয়া জাতীয় পাখি, কিন্তু আয়তনে কাকাতুয়ার চেয়ে প্রায় চারগুণ বড়। এর আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। এত

রঙের বাহার পৃথিবীতে আর কোনও পাখির আছে বলে মনে হয় না। দেখলে মনে হয় প্রকৃতি যেন রামধনুর সাতটি রং নিয়ে খেলা করতে করতে খেয়ালবশে পাখিটির গায়ে তুলির আঁচড় কেটেছেন। এ পাখি ঘরে রাখলে ঘর আলো হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার বাগানে ও এল কী করে ?

আর গাছ থেকে উড়ে এসে আমার কাঁধে বসবে কেন এ পাখি ?

যাই হোক ইনি আমার পোষা না হলেও, আমার কাছে থাকতে এঁর কোনও আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।

আমি ম্যাকাওটিকে কাঁধে নিয়ে বাড়ির ভিতর চলে এলাম। তারপর আমার ল্যাবরেটরিতেই সেটাকে রাখবার ব্যবস্থা করলাম। ল্যাবরেটরিতেই আমার অধিকাংশ সময় কাটে। পাখিটাকে চোখে চোখে রাখার সুবিধা হবে। একবার মনে হয়েছিল যে আমার ওষুধপত্রের উৎকট গন্ধে হয়তো এর আপত্তি হবে—কিন্তু সে টু শব্দটি করল না।

আমার বেড়াল নিউটন দু'-একবার ফ্যাঁস ফোঁস করেছিল কিন্তু পাখির দিক থেকে কোনও রকম বিরক্তি বা শত্রুতার লক্ষণ না দেখে সে চুপ করে গেল। কিছুদিন পরে হয়তো দেখব পরস্পরের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বই হয়েছে।

সকালে দুটো ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট খেয়েছে পাখিটা। তারপর তার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি। প্রহ্লাদ প্রথমে যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল তারপর সেও পাখিটাকে মেনে নিয়েছে। আমার বিশ্বাস কয়েক দিনের ভিতর প্রহ্লাদও পাখিটাকে আমার মতন ভালবেসে ফেলবে। আজ ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে অনেকবার পাখিটার দিকে চোখ পড়ে গেছে। প্রতিবারই দেখেছি সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। কার পাখি, কোত্থেকে এল কে জানে !

১৯শে জুন

আজ এক অদ্ভুত ঘটনা।

গিনিপিগের খাঁচা থেকে টেবিলে এনে ওষুধের বোতলটি হাত থেকে নামিয়ে রাখছি এমন সময় হেঁড়ে কর্কশ গলায় প্রশ্ন এল—'কী করচ ?'

আমি চমকে এদিক ওদিক চেয়ে ম্যাকাওটার দিকে চাইতে সেটার ঠোঁটটা নড়ে উঠল।

'কী কর্‌রচ ? কী কর্‌রচ ?'

আমি তো অবাক। এ যে কথা বলে।

শুধু কথা নয়। এমন স্পষ্ট কথা আমি পাখির মুখে কখনই শুনিনি।

আমি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে ম্যাকাওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর পাখিটার মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোল যেটা খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ হাসি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আমার হাতের বোতলটা হাতেই রয়ে গেল।

তারপর দেখি ম্যাকাওটার ঠোঁট আবার নড়ছে—'ওটা কী ? ওটা কী ? ওটা কী ?'

এবার আমার হাসির পালা। ম্যাকাওটা জানতে চায় বোতলে কী আছে !

আমার হাসি শুনে ম্যাকাও মশাই যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর গলার স্বরটিকে আরেকটু কর্কশ করে কথা এল—'হাসির কী ? হাসির কী ? হাসির কী ?'

না, এঁকে সিরিয়াসলি না নিলে বোধহয় ইনি অসন্তুষ্ট হবেন। আমি গলাটা খাঁকরে নিয়ে বললাম—'এতে একটা ওষুধ আছে। সেটা যে খাবে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

www.BDeBooks.Com

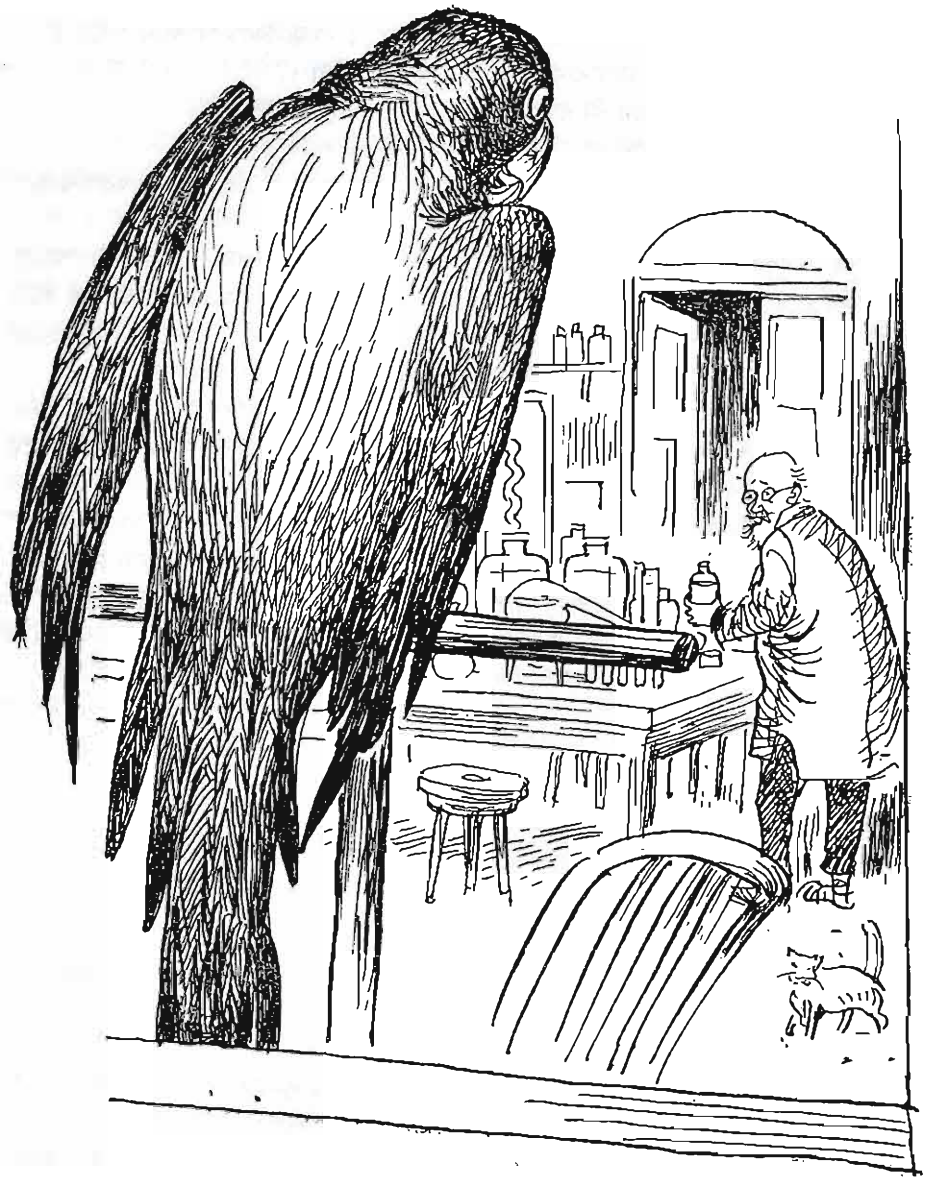

'বটে ? বটে ?'

'হ্যাঁ। এখন খেলে ঘণ্টা পাঁচেকের জন্য অদৃশ্য। অনুপানে তফাত করলে সময় বাড়ানো কমানো যেতে পারে।'

ম্যাকাওটা কিছুক্ষণ চুপ করে একটা শব্দ করল, সেটা ঠিক মানুষের গম্ভীর গলায় 'হুঁ' বলার মতো শোনাল।

তারপর আবার প্রশ্ন এল—'কী ওষুধ ? কী ওষুধ ?'

আমি কোনওমতে হাসি চেপে বললাম...'এখনও নাম দিইনি। কী কী মিশিয়ে তৈরি সেটা

বলতে পারি। এক্সট্রাক্ট অফ গরগনাসস, প্যারানইয়াম পোটেনটেট, সোডিয়াম বাইকারবোনেট, বাবুইয়ের ডিম, গাঁদালের রস আর টিনচার আয়োডিন।'

ম্যাকাও এবার চুপ। দেখলাম সে একদৃষ্টে ল্যাবরেটরির মেঝের দিকে চেয়ে আছে। আমি এবার বললাম, 'তুমি এমন আশ্চর্য কথা বলতে শিখলে কী করে ?'

ম্যাকাও নির্বাক।

আমি আবার বললাম, 'কী করে শিখলে ?'

একবার মনে হল ম্যাকাওর ঠোঁটটা নড়ে উঠল। কিন্তু কথা বেরোল না। পড়ে পাওয়া এই বিচিত্র পাখি যে আবার কথা বলতে পারবে এ তো ভাবাই যায়নি। এটা একেবারে ফাউ।

২২শে জুন

আজ এই আধঘণ্টা আগে, রাতের খাওয়া শেষ করে ল্যাবরেটরির দিকে যাচ্ছি ঘরটায় তালা দেব বলে এমন সময়ে দরজার মুখটাতে আসতেই একটা বিড়বিড় করে কথা বলার শব্দ পেলাম। এটা ম্যাকাওটারই কথা কিন্তু আস্তে আস্তে চাপা গলায় কথা বলছে সে। আমি পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে কান পাততেই কথাটা স্পষ্ট হয়ে এল।

'এক্সট্রাক্ট অফ গরগনাসস, প্যারানইয়াম পোটেনটেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, বাবুইয়ের ডিম, গাঁদালের রস, টিনচার আয়োডিন'—, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দশবার এই নামের আবৃত্তি শুনে তারপর গলা খাঁকরিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে বললাম, 'গুড নাইট !'

ম্যাকাও তার আবৃত্তি থামিয়ে কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'বুয়েনা নোচে'। অর্থাৎ গুড নাইটের স্প্যানিশ অনুবাদ।

এর আদি বাসস্থান যে সত্যিই দক্ষিণ আমেরিকা সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না। ল্যাবরেটরিতে যখন তালা লাগাচ্ছি তখন শুনতে পেলাম আবার আবৃত্তি শুরু হয়েছে।

আমি এই অত্যাশ্চর্য পাখির বাকশক্তি আর স্মরণশক্তির কথা ভাবতে ভাবতে ওপরে চলে এলাম।

২৪শে জুন

আজ বড় দুঃখের দিন।

আমার প্রিয় ম্যাকাও পাখিটি উধাও হয়েছেন। উধাও মানে অদৃশ্য নয়। অর্থাৎ আমি তার উপর কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিনি। সে সত্যি সত্যিই কোথায় যেন চলে গেছে। এটা তার হঠাৎ আবির্ভাবের মতোই রহস্যজনক।

সকালে ল্যাবরেটরির দরজা খুলে দেখি উত্তর দিকের জানালার পাশে রাখা লোহার দাঁড়টা খালি। পাখিটার উপর আমার এতই বিশ্বাস ছিল যে তাকে চেন দিয়ে বেঁধেও রাখিনি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে জানালাটায় আমি নিজের হাতে ছিটকিনি লাগিয়েছিলাম। এখন দেখি জানালাটা খোলা। গরাদের ফাঁক দিয়ে কসরত করে বেরিয়ে যাওয়া পাখিটার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু ছিটকিনি খুলল কে ? তা হলে কি ম্যাকাও-বাবাজি তাঁর বিরাট ঠোঁট দিয়ে নিজেই এ কর্ম করেছেন ? কিন্তু এত পোষা পাখি, খাদ্য বা যত্নেরও তো কোনও অভাব ছিল না—সে পাখি পালাবে কেন ?

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল ! একটা টকটকে লাল পালক পড়েছিল জানালাটার কাছে

www.BDeBooks.Com

মেঝেতে। আমি সেটাকে যত্ন করে তুলে রেখে দিলাম। তার পরে ল্যাবরেটরি বন্ধ করে দোতলায় এসে চুপ করে শোবার ঘরের জানালার ধারে আমার বেতের চেয়ারটায় বসে রইলাম।

বিকেলে আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু এসেছিলেন। চা খেতে খেতে এমন বকবক শুরু করলেন যে একবার ইচ্ছে হল আর এক পেয়ালা চা অফার করে তার সঙ্গে একটু নতুন ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে তাঁকে একটু শিক্ষা দিই। কিন্তু সেটার আর প্রয়োজন হল না।

ভদ্রলোক যেন আমার মেজাজের কথা অনুমান করে নিজেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

শুধু পাখির রহস্যের সমাধান হল না বলে নয় পাখিটার উপর সত্যিই মায়া পড়েছিল—তাই আমার মনের এই অবস্থা।

কাল থেকে আবার ওষুধটা নিয়ে পড়তে হবে। আমি জানি একমাত্র কাজই আমার এই বন্ধু-বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলতে সাহায্য করবে।

২১শে জুলাই

আজকের ঘটনা যেমনই রোমাঞ্চকর তেমনই অবিশ্বাস্য। ক'জন বৈজ্ঞানিকের জীবনে এমন সব চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছে জানতে ইচ্ছা করে।

ক'দিন থেকেই বৃষ্টি হবার ফলে একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল। উশ্রীর ধারে সকালটায় বেশ আরাম বোধ করেছিলাম, তাই বোধ হয় বেড়ানোর মাত্রাটা আজ একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি যখন ফিরছি তখন প্রায় সাতটা বাজে। প্রহ্লাদের তখনও বাজার থেকে ফেরার কথা নয়। তাই বাড়ির কাছাকাছি এসে সদর দরজাটা খোলা দেখে মনে কেমন জানি খটকা লাগল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারলাম যে তালাটা স্বাভাবিক ভাবে খোলা হয়নি। কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে উত্তাপের সাহায্যে গলিয়ে সেটাকে খোলা হয়েছে।

আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল নিউটনকে। সে বৈঠকখানার এক কোণে শজারুর মতো লোম খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে।

নিউটনের এমন সন্ত্রস্ত ভাব আমি আর কোনওদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আবার একটা শব্দ শুনলাম আমার ল্যাবরেটরির দিক থেকে। কে যেন আমার জিনিসপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমার ফ্লাস্ক, রিটর্ট, টেস্ট টিউব ইত্যাদি গবেষণার যাবতীয় সরঞ্জাম সব চারদিকে ছড়ানো, আলমারি খোলা, বইপত্তর সব ধুলোয় লুটোপুটি, ওষুধের বোতল খোলা অবস্থায় টেবিলে পড়ে তার থেকে ওষুধ বেরিয়ে টেবিলের গা বেয়ে চুঁইয়ে টপটপ করে মেঝেতে পড়ছে।

পরমুহূর্তেই আর একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। আমার এক গোছা নোটস-এর খাতা শূন্যে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে করতে হঠাৎ জানালার দিকে উড়ে গেল!

জানালার শিকগুলোকে দেখি গলিয়ে খুলে ফেলা হয়েছে। আমি কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব থেকে তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে একলাফে আমার জিনিসপত্র ডিঙিয়ে জানালার কাছে গিয়ে আমার খাতাগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

তারপর এক বিচিত্র যুদ্ধ। কোনও এক অদৃশ্য ডাকাতের সঙ্গে চলল আমার ধস্তাধস্তি! লোকটা তেমন জোয়ান নয়। সে অদৃশ্য হওয়াতে তার সঙ্গে যুঝতে আমার বেশ বেগ পেতে

হল। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই। ওই খাতাগুলিই আমার প্রাণ। ওতে রয়েছে আমার চল্লিশ বছরের বৈজ্ঞানিক জীবনের সমস্ত ফলাফল। মরিয়া হয়ে শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করে বেপরোয়া কিল ঘুঁসি লাথি মেরে খাতাগুলো উদ্ধার করবার পরমুহূর্তেই লোকটা জানালা টপকিয়ে বাইরের বাগানে গিয়ে পড়ল। আমি কোনওমতে জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি বাগানের ঘাসের উপর দিয়ে একটা পায়ের ছাপ পাঁচিলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

তারপর কানে এল এক পরিচিত পাখির কর্কশ কণ্ঠস্বর ও ডানার ঝটপটানি।

পূর্বদিকের পাঁচিল বেয়ে উঠে তখন লোকটা পালাবার চেষ্টা করছে। কারণ পাঁচিলের গায়ের ফাটল থেকে যে অশ্বত্থের চারা বেরিয়েছিল সেটা চোখের সামনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আর সেই সময়ে শুনলাম এক মানুষের গলার আর্তনাদ।

এ গলা আমার চেনা গলা।

এ গলা প্রোফেসর গজানন তরফদারের।

অদৃশ্য ম্যাকাও অদৃশ্য প্রোফেসরকে আক্রমণ করেছে।

পাঁচিলের গা বেয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে বাগানের ঘাসের দিকে।

তারপর শব্দ হল—ধুপ।

প্রোফেসর তরফদার পাঁচিল টপকিয়ে ওপাশের জমিতে পড়েছেন।

তারপর সব শেষে পলায়মান পায়ের শব্দ।

আমি জানালার পাশের চেয়ারটায় ক্লান্তভাবে বসে পড়লাম।

বুকে হাত দিয়ে বুঝলাম হৃৎস্পন্দন রীতিমতো বেড়ে গেছে।

এই বারে একটা ঠং শব্দ শুনে মাথা তুলে দেখি ম্যাকাও-এর দাঁড়টা ঈষৎ কম্পমান।

বাবাজি ফিরে এসেছেন!

'বুয়েনা দিয়া! বুয়েনা দিয়া!'

আমি ইংরাজিতে উত্তর দিলাম, 'গুড মর্নিং! ব্যাপার কী?'

'ফিরেচি! ফিরেচি!'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি, থুড়ি, শুনতে পাচ্ছি!'

'চোর, চোর! জোচ্চোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর!'

'কে?'

'তর্‌রফদার্‌র্‌!'

'তাকে তুমি চিনলে কী ভাবে?'

ম্যাকাও যা বলল তাতে এক আশ্চর্য কাহিনী প্রকাশ পেল।

তরফদার গিয়েছিলেন ব্রেজিলে বছরখানেক আগে। সেখানে এক সার্কাস থেকে এই পাখিটি তিনি নিয়ে আসেন, তাও চুরি করে। সতেরোটি বিদেশি ভাষা জানা, অলৌকিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এই ম্যাকাওটিকে নিয়ে সেই সার্কাসে খেলা দেখাত এক বাজিকর। কাজেই তার বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তির ব্যাপারে তরফদারের কোনও কৃতিত্ব নেই।

যদিও ম্যাকাও বাংলা শিখেছে তরফদারের কাছেই।

তরফদার পাখিটিকে আমার গোলঞ্চগাছের ডালে রেখে যান যাতে সে আমার সঙ্গে থেকে, আমার ফরমুলা সংগ্রহ করে, তারপর তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সেই ফরমুলা বলে দেয়।

অদৃশ্য হবার ওষুধের উপাদানগুলি ম্যাকাওটির কাছ থেকে জেনে নিয়ে তারপর তাই দিয়ে দশ ঘণ্টা অদৃশ্য থাকবার মতো একটা মিক্সচার তৈরি করে সেটা পান করে তরফদার নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলেন।

www.BDeBooks.Com

সেই সময় ম্যাকাওটি তরফদারের হাবভাব লক্ষ করে বুঝতে পারে যে এবার তিনি তাঁর পোষা পাখিটিকে হত্যা করবার ফন্দি করেছেন। কারণ তাঁর হয়তো ভয় হয়েছে যে পাখিটি ভবিষ্যতে অন্য কোনও বৈজ্ঞানিকের কাছে ফরমুলাটি ফাঁস করে দিতে পারে। অদৃশ্য তরফদারের আলমারি খুলে যখন তার ভেতর থেকে বন্দুক এবং টোটা বেরিয়ে আসে সেই সময় ম্যাকাওটি আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় না দেখে ঠোঁটের এক কামড়ে ওষুধের বোতলটি খুলে ফেলে ঢক ঢক করে খানিকটা ওষুধ গিলে ফেলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তরফদার এদিক ওদিক গুলি চালিয়ে ঘরের দেয়াল ক্ষতবিক্ষত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। তারপর সেই অদৃশ্য অবস্থাতেই গাড়ি চালিয়ে তরফদার হাজারিবাগ থেকে গিরিডি চলে আসেন। গাড়ির পিছনের সিটেই যে ম্যাকাওটি বসেছিল তিনি টেরই পাননি।

গিরিডি পৌঁছে গাড়িটাকে একটু দূরে রেখে দিয়ে শেষ রাত্তির থেকে আমার বাড়ির কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে ওত পেতে বসে থাকা এবং আমি ও প্রহ্লাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ডাকাতির তোড়জোড় !

আমি জিজ্ঞেস করলাম—'ডাকাতির সময়ে তুমি কোথায় ছিলে ?'

'বাইরে, বাইরে। তোমার গাছে।'

'তারপর ?'

'ও বেরোলেই ধরলাম। চোর চোর, জোচ্চোর জোচ্চোর।'

'আর আমি ?'

'ভাল, ভাল। এখানেই থাকব।'

'বেশ তো, থাকো না। আর কোনও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দোস্তি নেই তো ? আমার ফরমুলা অন্যের কাছে পৌঁছবে না তো ?'

ম্যাকাও আবার সেইভাবে অট্টহাস্য করল।

জিজ্ঞেস করলাম—'ওষুধ কটায় খেয়েছ ?'

'রাত দশটা।'

'বটে এখন তো আটটা বাজে। দশ ঘণ্টা তো হয়ে এল।'

'তা তো বটেই ! হ্যাঃ, হ্যাঃ, হ্যাঃ, হ্যাঃ !'

সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম আমার ঘরটা আস্তে আস্তে আলো হয়ে উঠল। সূর্যের আলো নয়, ম্যাকাওর বহুবিচিত্র পালকের চোখ ঝলসানো রং-এর আলোয় আমার ল্যাবরেটরির চেহারা ফিরে গেল।

আমি আমার খাতাগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ম্যাকাওটার মাথায় হাত বুলিয়ে বললুম 'থ্যাঙ্ক ইউ !'

ম্যাকাও বলল, 'গ্রাসিয়া, গ্রাসিয়া !'

সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৭১

প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল

আজ আমার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন! সুইডিস অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স আজ আমাকে ডক্টর উপাধি দান করে আমার গত পাঁচ বছরের পরিশ্রম সার্থক করল। এক ফলের বীজের সঙ্গে আর এক ফলের বীজ মিশিয়ে এমন আশ্চর্য সুন্দর, সুগন্ধ, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর নতুন ফল যে তৈরি হতে পারে, এটা আমার এই রিসার্চের আগে কেউ জানত না। গতবছর সুইডেনের বৈজ্ঞানিক স্‌ভেন্ডসেন আমার গিরিডির ল্যাবরেটরিতে এসে আমার ফলের নমুনা দেখে এবং চোখ একেবারে থ। দেশে ফিরে গিয়ে কাগজে লেখালেখির ফলে আমার এই আবিষ্কারের কথা বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে! আমার আজকের এই সম্মানের জন্য স্‌ভেন্ডসেন অনেকখানি দায়ী! তাই এখন ডায়রি লিখতে বসে তাঁর প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে!

সুইডেনে আগে আসিনি। এসে ভালই লাগছে। সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ। এটা মে মাস—তাই চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্য দেখছি। কিন্তু সে সূর্য কেমন ঘোলাটে, নিস্তেজ। সবসময়ই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে আছে। শীতকালে যখন রাত ফুরোতে চায় না তখন না জানি লোকের মনের অবস্থা কেমন হয়। শুনেছি ছ মাস রাত্রের পর প্রথম সূর্যের আলো দেখে এখানের লোক নাকি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আত্মহত্যা করে। আমরা যারা বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকি, তারা বোধ হয় ভালই আছি। বেশি উত্তরে ঠাণ্ডা দেশে যারা থাকে তাদের হিংসে করার কোনও কারণ নেই।

এখানের কাজ সেরে নরওয়েতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। এর অবিশ্যি একটা কারণ আছে। বছর চারেক আগে যখন ইংলন্ডে যাই তখন বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ প্রোফেসর আর্চিবল্ড অ্যাক্‌রয়েডের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। সাসেক্সে তাঁর কটেজে একটা উইক এন্ডও কাটিয়ে এসেছিলাম। অ্যাক্‌রয়েডও তখন নরওয়ে যাব যাব করছেন, কারণ সেখানে নাকি 'লেমিং' বলে ইঁদুর জাতীয় এক অদ্ভুত জানোয়ার বাস করে—সেইটে তিনি স্টাডি করবেন। লেমিং এক আশ্চর্য প্রাণী। বছরের কোনও একটা সময় এরা কাতারে কাতারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে। পথে শেয়াল, নেকড়ে, ঈগল পাখি ইত্যাদির আক্রমণ অগ্রাহ্য করে খেতের ফসল নিঃশেষ করে, সব শেষে সমুদ্রে পৌঁছে সেই সমুদ্রের জলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে!

দুঃখের বিষয় অ্যাক্‌রয়েডের স্টাডি বোধ হয় অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল, কারণ গিরিডি থাকতেই কাগজে পড়েছিলাম, নরওয়ে ভ্রমণের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। অ্যাক্‌রয়েডের পক্ষে যেটা সম্ভব হয়নি, আমার দ্বারা সেটা হয় কি না দেখব বলেই নরওয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।

রাত্রে ডিনারের পর হোটেলে ফেরার কিছু পরে আমার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল, তখনও আমার মাথায় লেমিং-এর চিন্তাই ঘুরছিল। দরজা খুলে দেখি একটি মাঝবয়সি লম্বা ভদ্রলোক, মাথায় সোনালি চুল, চোখে সোনার চশমা, আর সেই চশমার পুরু কাচের পিছনে এক জোড়া তীক্ষ্ণ নীল চোখ। ভদ্রলোক ঠোঁট ফাঁক করে অল্প হেসে যখন তাঁর পরিচয় দিলেন তখন লক্ষ করলাম তাঁর একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। তাঁর কথায় জানলাম তাঁর

www.BDeBooks.Com

বাস নরওয়ের সুলিটেল্‌মা শহরে। নাম গ্রেগর লিন্ডকুইস্ট। লোকটি নাকি শিল্পী, বিখ্যাত লোকদের প্রতিকৃতি তৈরি করেন ঠিক পুতুলের মতো করে। অর্থাৎ গায়ের রং, চুল, নখ, পোশাকটোশাক সব আসল মানুষের মতোই, কেবল সাইজ ছ ইঞ্চির বেশি নয়।

একথা সেকথার পর একটু বিনয়ী, কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন 'আপনি যদি আমার ওখানে দিনকতক আতিথ্য গ্রহণ করেন তা হলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব, সেই অবসরে আপনার একটি পুতুল-প্রতিকৃতি গড়ে নিতে পারব।' লিন্ডকুইস্ট আরও বললেন যে তাঁর কালেকশনে নাকি কোনও বিখ্যাত ভারতীয়ের পুতুল-মূর্তি নেই, এবং আমি এই প্রস্তাবে রাজি হলে নাকি তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

কথায় কথায় আমার লেমিং সম্পর্কে জানবার আগ্রহটাও প্রকাশ পেয়ে গেল। তাতে ভদ্রলোক বললেন, লেমিং-এর সন্ধানে বনবাদাড়ে ঘোরার আগে তিনি তাঁর বাড়িতেই নাকি একটি লেমিং সংগ্রহ করে আমাকে দেখাতে পারবেন। এর পরে আর আমার কিছু বলার রইল না।

আগামী বৃহস্পতিবার ভদ্রলোকের সঙ্গেই নরওয়ে যাত্রা করব স্থির করেছি।

১৭ই মে

দু' দিন হল সুলিটেল্‌মা শহরে এসেছি। নরওয়ের উত্তরপ্রান্তে কিয়োলেন উপত্যকায় এ শহরটি ভারী মনোরম। আশেপাশে তামার খনি রয়েছে, আর শহরের পশ্চিমদিকে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সুলিটেল্‌মা পর্বতশৃঙ্গ। ৬০০০ ফিটের মতো হাইট, কাজেই আমাদের হিমালয়ের এক একটি শৃঙ্গের কাছে একে সামান্য টিলা বলে মনে হবে। কিন্তু নরওয়েতে এই শৃঙ্গ উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

লিন্ডকুইস্ট আমাকে পরম যত্নে রেখেছেন। এঁর বাড়ির আশেপাশে আর কোনও বাড়িটাড়ি চোখে পড়ে না। এমনিই নরওয়ে দেশটায় লোকসংখ্যা কম, তার মধ্যেও লিন্ডকুইস্ট যেন একটি জনবিরল পরিবেশ বেছেই নিয়েছে। আমার এতে কোনও আপত্তি নেই। আমাদের গিরিডির বাড়িটাও নিরিবিলি জায়গা বেছেই তৈরি করেছিলাম আমি।

লেমিং এখনও দেখা হয়নি। দু'-এক দিন সময় চেয়ে নিয়েছে লিন্ডকুইস্ট। এতেও আপত্তি নেই—কারণ আমি হাতে কিছুটা সময় নিয়েই দেশ ছেড়েছি। আপাতত বিশ্রামের প্রয়োজন। ট্রাউট মাছ খাচ্ছি আর খুব ভাল cheese খাচ্ছি। সব মিলিয়ে বেশ আরামে আছি।

তবে লিন্ডকুইস্টের একটা বাতিক মাঝে মাঝে কেমন যেন অসোয়াস্তির সৃষ্টি করে। সে আমার দিকে প্রায়ই একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কথা বলার সময় চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যখন দু'জনে চুপচাপ বসে থাকি, তখনও মাঝে মাঝে অনুভব করি যে সে স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আজ সকালে এর কারণটা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। লিন্ডকুইস্ট বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, কোনও লোকের পোর্ট্রেট করার আগে কিছুদিন যদি ভাল করে তাকে দেখা যায়, তা হলে মূর্তি গড়ার সময় শিল্পীর কাজ সহজ হয়ে যায় এবং যার পোর্ট্রেট হচ্ছে তাকেও আর একটানা বেশিক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে হয় না।

আমার আরেকটা প্রশ্ন আরও চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, 'আপনার পুতুলগুলি কবে দেখাবেন? বড় কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু।'

লিন্ডকুইস্ট বলল, 'পুতুলগুলোয় ধুলো পড়েছে। আমার চাকর হান্‌স সেগুলো পরিষ্কার

করলে পর কাল সন্ধ্যা নাগাদ সেগুলো দেখাতে পারব বলে আশা করছি।'

'আর লেমিং ?'

'আগে পুতুল—তারপর লেমিং। কেমন ?'

অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম।

১৮ মে রাত ১২টা

দু' ঘণ্টা হল ঘরে ফিরেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তেজনা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই আজকের ঘটনা পরিষ্কার করে লিখতে রীতিমতো অসুবিধে হচ্ছে।

আজ সন্ধ্যা সাতটায় (সন্ধ্যা বলছি ঘড়ির টাইম অনুযায়ী কারণ এখানে সত্যিকারের রাতদিনের কোনও তফাত বোঝা যায় না) লিন্ডকুইস্ট তার বৈঠকখানায় একটা গোপন দরজা খুলে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমাকে মাটির নীচে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তার পুতুলগুলো দেখাল। আমি এ রকম আশ্চর্য জিনিস আর কখনও দেখিনি।

টেবিলের উপর রাখা কাচের আবরণে ঢাকা যে জিনিসগুলি দেখলাম সেগুলিকে পুতুল বলতে বেশ দ্বিধা বোধ করছি। আসল মানুষের সঙ্গে এদের তফাত কেবল এই যে এগুলো নিষ্প্রাণ। এবং এদের কোনওটাই ছ ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে আসল মানুষের যা আয়তন, এগুলি তার দশভাগের এক ভাগ।

সব সুদ্ধ ছ'টি পুতুল রয়েছে। সবই নামকরা লোকের, যদিও এদের সকলের চেহারার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। যাদের দেখে চিনলাম, তাদের মধ্যে রয়েছে—ফরাসি ভূপর্যটক আঁরি ক্লেমো, আর নিগ্রো চ্যাম্পিয়ন বক্সার বব স্লিম্যান।

আর ছ' নম্বর কাচের খাঁচায় যে পুতুলটি কালো চশমা পরে ডান হাত কোটের পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি হলেন পরলোকগত ব্রিটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ ও আমার বন্ধু আর্চিবল্ড অ্যাক্‌রয়েড—ছ' বছর আগে লেমিং-এর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে নরওয়েতেই যাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যাক্‌রয়েডের পুতুল দেখেই বুঝতে পারলাম পোর্ট্রেট হিসেবে এগুলো কী আশ্চর্যরকম নিখুঁত। শুধু যে মোটামুটি তাঁর চেহারা মিলেছে তা নয়—এগুলো এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি যাতে নাকি মাথার চুল, গায়ের চামড়া, চোখের তারা, সবই একেবারে জীবন্ত বলে মনে হয়।

এই শেষ পুতুলটি দেখে তো নিশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। অ্যাক্‌রয়েডের সামনে আমাকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লিন্ডকুইস্ট জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ? একে চেনো নাকি ?'

বললাম, 'বিলক্ষণ। ইংলন্ডে আলাপ হয়েছিল—প্রায় বন্ধুত্বই। লেমিং-এর খবর ওঁর কাছেই পাই। নরওয়েতেই তো ওঁর মৃত্যু হয় বলে শুনেছিলাম।'

'তা হয়। তবে আমার ভাগ্যটা খুবই ভাল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই আমার এখানে এসেছিলেন, আর তখনই এই পুতুলটি তৈরি করে ফেলি। যাদের পুতুল দেখছ তাদের সকলেই আমার বাড়িতে থেকে আমাকে সিটিং দিয়ে গেছে।'

গুপ্ত ঘরটা থেকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় লিন্ডকুইস্ট বলল, 'পরশু থেকে তোমার পোর্ট্রেটের কাজ শুরু করব।'

আমি ঘরে বসে বসে ডায়রি লিখছি, আর অ্যাক্‌রয়েডের সেই হাসি হাসি মুখটা আমার মনে পড়ছে। কোনও মানুষের পক্ষে যে এমন পুতুল তৈরি করা সম্ভব হতে পারে এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। লিন্ডকুইস্ট লোকটা কি শুধুই শিল্পী—না বৈজ্ঞানিকও বটে ? কী উপাদান দিয়ে ও পুতুলগুলি গড়ে, যাতে চোখ, নখ, চামড়া, চুল এত আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক

www.BDeBooks.Com

বলে মনে হয়। আশা করি আমার মূর্তিটি ও আমার সামনেই গড়বে, যাতে মালমশলা নিজের চোখে দেখার সুযোগ হবে।

কাল সকালে বরং ওকে এ বিষয় দু-একটা প্রশ্ন করে দেখব, দেখি না কী বলে।

আপাতত লেমিং-এর প্রশ্নটা স্থগিত রেখে পুতুল নিয়েই পড়া যাক।

১৯শে মে

কাল রাত্রে একটি ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে একটা তীব্র উগ্র গন্ধ নাকে আসতে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। গন্ধটা অনেকক্ষণ ছিল। কিছু পরিচিত এবং কিছু অপরিচিত জিনিস মেশানো একটা নতুন গন্ধ। চেনার মধ্যে কপার সালফেট ও ফেরাস অক্সাইড। এ ছাড়া কেমন যেন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ সেটা কেমিক্যালও হতে পারে বা অন্য কিছুও হতে পারে। মোটকথা এই বাড়িতে কিংবা বাড়ির আশেপাশে কোথাও কেমিক্যাল নিয়ে কারবার চলেছে। লিন্ডকুইস্ট যে বৈজ্ঞানিকও সে সন্দেহটা আরও দৃঢ় হল।

সকালে বুড়ো চাকর হান্‌স এসে বলল, 'বাবু একটু বেরিয়েছেন ; আপনাকে অপেক্ষা না করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিতে বলেছেন !'

খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ির ভিতরে এবং আশপাশটায় একটু পায়চারি করে দেখলাম। এখানে সেখানে ঝোপঝাড়ের পিছনে ফ্লাস্ক, টেস্টটিউবের টুকরো এবং একটা মরচেধরা বুনসেন বার্নার দেখে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না। পুতুলগুলোর পিছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারসাজি রয়েছে। আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়।

একটা খটকা কেবল মনে খোঁচা দিচ্ছে। যে বৈজ্ঞানিক, সে আর একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে নিজেকে শিল্পী বলে পরিচয় দেবে কেন ?

সাড়ে ন'টা নাগাদ যখন ঘরে ফিরছি তখনও লিন্ডকুইস্টের দেখা নেই। হান্‌স-কে জিজ্ঞেস করাতে সে তার ফেরার টাইম কিছু বলতে পারল না। একা ঘরে বসে থাকতে থাকতে মাথায় একটা বদ্‌বুদ্ধি এল। দিনের বেলা পুতুলগুলোকে আর একবার দেখে আসতে পারলে কেমন হয় ?

গুপ্ত ঘরের দরজাটা খোলার একটা সংকেত আছে। দরজার হাতলটা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তারপর সেটাকে একটা টান দিলেই সেটা খুলে যায়। গতকাল লিন্ডকুইস্ট হাতলটা নিয়ে কবার ডানদিকে কবার বামদিকে ঘুরিয়ে তারপর টানটা দিয়েছিল সেটা আমি মনে মনে মুখস্থ করে রেখেছিলাম। সাধারণ লোকের পক্ষে অবিশ্যি এ কাজটা সম্ভব হত না।

হান্‌স-কে ডেকে বললাম, 'আমার একটা জরুরি টেলিগ্রাম পাঠানো দরকার। তুমি যদি কাজটা করে দিতে পার—আমার ঠাণ্ডা দেশে এসে একটু হাঁপ ধরেছে—এতটা পথ হাঁটতে ভরসা পাচ্ছি না।'

হান্‌স অবিশ্যি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল, এবং আমিও আমার বাড়ির চাকর প্রহ্লাদের নামে একটা আজগুবি টেলিগ্রাম লিখে হান্‌সকে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

হান্‌স রওনা হবার পর আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে আমি বাড়ির গেটের বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক চাইলে বহুদূর অবধি দেখা যায়। লিন্ডকুইস্টের কোনও চিহ্ন দেখলাম না—বুঝলাম সে ফিরলেও মিনিট পনেরোর আগে নয়।

ভেতরে ফিরে এসে গুপ্ত দরজায় গিয়ে মুখস্থমাফিক হাতলটা এদিক ওদিক ঘোরানো শুরু করলাম। যথাসময়ে একটা খট্ শব্দে দরজাটা খুলে গেল। পকেটে টর্চ ছিল। সেটা জ্বেলে

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম !

গুপ্ত ঘরে পৌঁছে একটা করে কাচের খাঁচাগুলোর উপর আলো ফেলে দেখতে শুরু করলাম। কালকের চেয়ে কোনও বিশেষ তফাত চোখে পড়ল না। এক নম্বরে সেই ইটালিয় গায়ক—নাম বোধ হয় মারিয়ো বাতিস্তা, দুই-এ মুষ্টিযোদ্ধা বব স্লিম্যান, তিন-এ ফরাসি পর্যটক আঁরি ক্লেমো, চার-এ জাপানি সাঁতারু হাকিমোতো, পাঁচে সেই জার্মান কবি, নাম মনে নেই, আর ছ'য়ে আমার বন্ধু অ্যাক্‌রয়েড।

আমি টর্চটা নিয়ে অ্যাক্‌রয়েডের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলাম। খাঁচাগুলি বেশ। এরকম জিনিস এর আগে দেখিনি কখনও। একরকম কাচের আবরণ থাকে—মন্দিরের চুড়োর মতো, যাতে অনেক সময় ভাল ঘড়ি কিংবা মূর্তি ঢাকা দেওয়া থাকে। এ কতকটা সেই রকম কিন্তু তফাত এই যে এতে আবার একটা দরজা আছে। এবং তাতে কবজা এবং চাবি লাগানোর বন্দোবস্ত আছে। অবিশ্যি ইচ্ছা করলে পুরো ঢাকনাটাই হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

আমি কাচের সঙ্গে প্রায় মুখ লাগিয়ে দিয়ে অ্যাক্‌রয়েডের পুতুলটা দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হল গতকালের ভঙ্গির সঙ্গে যেন সামান্য একটু তফাত। কালকে যেন ডান হাতটা পকেটের মধ্যে আর একটু বেশি ঢোকানো মনে হয়েছিল। তাই কি ?—না আমার চোখের ভুল ? এমনও তো হতে পারে যে পুতুলগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ানোর ব্যবস্থা করা আছে। লিন্ডকুইস্ট হয়তো মাঝে মাঝে দরজা খুলে তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গিটা একটু বদল করে দেয়। কিংবা হয়তো পুতুলগুলোকে ঝাড়পোঁছ করার সময় হাত পা একটু নড়ে যায়। একবার খুলে পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয় ?

কিন্তু অ্যাক্‌রয়েডের পুতুলটায় হাত দিতে কেমন জানি সংকোচ বোধ হল, তাই জাপানি সাঁতারুর পুতুলের ঢাকনাটা খুলে সেটা আস্তে হাতে তুলে নিলাম। নিয়েই বুঝলাম যে হাত পা নাড়ানোর কোনও উপায় লিন্ডকুইস্ট রাখেনি। পুতুলগুলো একেবারেই অসাড় এবং অনড়।

কাচের ঢাকনা চাপা দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে গুপ্ত দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

লিন্ডকুইস্ট ফিরল সাড়ে বারোটার সময়। দুপুরে খাবার টেবিলে তাকে বললাম, 'আজ একটু পড়াশুনো করবার ইচ্ছে হচ্ছে। তোমাদের এখানেও শুনেছি বেশ ভাল একটা পাবলিক লাইব্রেরি আছে। একবার যাওয়া যায় কি ?'

লিন্ডকুইস্ট বলল, 'স্বচ্ছন্দে। আমি রাস্তা বাতলে দেব। আজই যাও—কারণ কাল থেকে তো তোমায় সিটিং দিতে হবে।'

আমি বিশ্রাম না করেই বেরিয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে কেমন জানি একটা অস্পষ্ট সন্দেহ উঁকি মারছিল, সেই কারণেই কিছু পুরনো খবরের কাগজ ঘাঁটার দরকার হয়ে পড়েছিল।

সাড়ে তিন ঘণ্টা লাইব্রেরিতে বসে 'লন্ডন টাইম্‌স' কাগজের ফাইল ঘেঁটে মনে গভীর সন্দেহ, উত্তেজনা ও উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। দু বছর আগের ১১ই সেপ্টেম্বরের টাইম্‌স কাগজে আর্চিবল্ড অ্যাক্‌রয়েডের মৃত্যুসংবাদ পড়ে জানতে পারলাম যে অ্যাক্‌রয়েড কীভাবে কোথায় মারা গিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। নরওয়ে ভ্রমণকালে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল ফিয়োর্ড পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে একটি নৌকোয় চাপতে। সেই নৌকোটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি—কাজেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে নৌকোডুবির ফলেই অ্যাক্‌রয়েডের মৃত্যু ঘটে।

বব স্লিম্যান, হাকিমোতো ও আঁরি ক্লেমোর মৃত্যুসংবাদও পড়লাম। এঁরা সকলেই ইউরোপে নিখোঁজ হয়েছেন, এবং সকলকেই অনেক অনুসন্ধানের পর মৃত বলেই ধরে নেওয়া

www.BDeBooks.Com

হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে এসে বাকিটা দিন যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবেই কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। লেমিং সম্পর্কে কৌতূহলটা মন থেকে প্রায় মুছে গেছে।

রাত্রে খেতে বসে লিন্ডকুইস্ট বলল, 'শঙ্কু তুমি মদ খাও না ? আমাদের দেশের একটা ভাল ওয়াইন একটু চেখে দেখবে নাকি ? আমার অবশ্য এই বিশেষ মদটা রোচে না তবে লোকে খুব ভাল বলে। একটু দেখো না খেয়ে।'

পাছে লিন্ডকুইস্টের মনে আমার সন্দেহ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ জাগে তাই আপত্তি করলাম না।

লিন্ডকুইস্ট খানিকটা মদ গ্লাসে ঢেলে দিল। গেলাসটা ঠোঁটের কাছে আনতেই কেমন জানি একটা সন্দেহজনক গন্ধ পেলাম। তাও সামান্য খানিকটা চুমুক দিয়ে সেটাকে ন্যাপকিনে ফেলে দিয়ে বললাম, 'এ ব্যাপারে তোমার ও আমার রুচি একই রকম। তার চেয়ে বরং তুমি যেটা পান করছ সেটাই কিছুটা আমাকে দাও না।'

লিন্ডকুইস্ট মদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছিল, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে অভিসন্ধিটা আমার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে।

আজ রাতটা যে করে হোক জেগে থেকে ও কী করে সেটা দেখতে হবে।

২০শে মে

কাল রাত্রে না ঘুমোনোর ফলে যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল সেটা আজ সকালেই লিখে ফেলেছি—

লিন্ডকুইস্টের এই কাঠের বাড়িতে দরজার চৌকাঠ বলে কিছু নেই। ফলে হয় কী পাশের ঘরে আলো জ্বালালে দরজা বন্ধ থাকলেও তার তলার ফাঁক দিয়ে সে আলো দেখা যায়। লিন্ডকুইস্টের বৈঠকখানায় কুকু ক্লক-এর কোকিল তখন সবে বারোটার ডাক ডেকেছে। আমি আমার সেই ঘুম-তাড়ানি ট্যাবলেটটা না খেয়েও তখন দিব্যি জেগে বসে আছি—কারণ মনে কেমন জানি দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে রাত্রে একটা কিছু ঘটবে। এমন সময় আমার বন্ধ দরজার তলা দিয়ে আলো দেখলাম। কে জানি বৈঠকখানায় আলো জ্বেলেছে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ ! তারপরেই একটা পরিচিত 'খুচ্' শব্দ শুনতে পেলাম।

এবার বৈঠকখানার বাতিটা নিবে গেল।

আমি মিনিটখানেক চুপ করে থেকে মোজা পায়ে আস্তে আস্তে আমার দরজার দিকে এগিয়ে সেটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে চোখ লাগিয়ে ওদিকে দেখে নিলাম ! তারপর দরজা খুলে এগিয়ে গেলাম। গুপ্ত দরজার দিকে গিয়ে দেখি দরজা খোলা।

বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তখন একটা অদম্য বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। সাড়ে তিন পাক নামলে পরে পুতুলের ঘরে পৌঁছানো যায়। তিন পাকের শুরুতেই একটা অদ্ভুত শব্দ আমার কানে এল।

আমার কান—শুধু কান কেন আমার সব ইন্দ্রিয়ই—সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ ; তবুও এ শব্দটা এতই নতুন, এটা চিনতে আমার বেশ কিছুটা সময় লাগল। অবশেষে হঠাৎ চিনতে পেরে বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল।

এ হল মানুষের চিৎকার ! কিন্তু গলার স্বরটা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক গুণে তীক্ষ্ণ ও মিহি। চিৎকারের ভাষাটা জাপানি।

আমার বুঝতে বাকি রইল না যে ওই জাপানি পুতুল সাঁতারু হাকিমোতোই কোনও বিপন্ন অবস্থায় পড়ে এ ভাবে আর্তনাদ করছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে চিৎকারটা শুনছি, এমন সময় হঠাৎ সেটা থেমে গেল। তারপর টং করে কাচের শব্দ। এ শব্দেরও কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। কাচের খাঁচার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ এটা।

আমার কৌতূহল এখন সব ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। আমি সিঁড়ির বাকি ধাপ কটা নেমে গিয়ে দেয়ালের পাশ দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম।

লিন্ডকুইস্ট একটা চাবি দিয়ে সেই ফরাসি পর্যটকের খাঁচাটা খুলেছে। তারপর হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে পুতুলটাকে বাইরে বের করে এনে তার গায়ে বাঁ হাত দিয়ে কী যেন একটা ঠেকাতেই পুতুলটা হাত পা ছুড়তে আরম্ভ করল—এবং তারপর শুরু হল ক্ষীণ মিহি সুরে আর্তনাদ। লিন্ডকুইস্টের ব্যবহারে কোনও বিচলিত হবার লক্ষণ দেখলাম না। সে আর্তনাদ অগ্রাহ্য করে একটা ছোট্ট ড্রপার দিয়ে পুতুলের হাঁ করা মুখে কী যেন পুরে দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে পুতুলের হাত পা ছোড়া থেমে গেল। তারপর লিন্ডকুইস্ট আগের সেই প্রথম জিনিসটা পুতুলের গায়ে ঠেকাতেই সেটার হাত পা অসাড় হয়ে আগের অবস্থায় চলে এল। লিন্ডকুইস্ট সেটাকে খাঁচার মধ্যে পুরে দাঁড় করিয়ে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল। আমি আমার জায়গায় বিহ্বল অথচ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পিছনেই দশ হাতের মধ্যেই যে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা লিন্ডকুইস্টের খেয়ালই হল না।

এরপরে অ্যাক্‌রয়েডের পালা।

উন্মাদ বৈজ্ঞানিকের হাতের মুঠোয় অ্যাক্‌রয়েডের শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার ক্রোধ ও উত্তেজনা সংবরণ করা কঠিন হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম অ্যাক্‌রয়েডের ছট্‌ফটানি থেমে গেল। এত দূর থেকেও মনে হল তার মাথাটা যেন আমারই দিকে ঘোরানো তারপর পরিষ্কার মার্জিত ইংরেজি উচ্চারণে অতি কষ্টে মিহি চিৎকার এল—'শঙ্কু, তুমি কী করছ এখানে—পালাও পালাও!'

পুতুলের মুখে আমার নাম শোনামাত্র লিন্ডকুইস্ট বিদ্যুদ্বেগে সিঁড়ির দিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই আমিও ঘুরে তিন চার সিঁড়ি একসঙ্গে উঠে বৈঠকখানা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য—লিন্ডকুইস্ট আর আমার ঘরের দিকে এল না।

এখন সকাল ৯টা। ব্রেকফাস্টের জন্য আমার ডাক পড়েনি। এটাও বুঝতে পেরেছি যে—আর ডাক পড়বে না। আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

২৩শে মে

কালকের ঘটনার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল। এখনও লিন্ডকুইস্টের দেখা নেই। আমার ঘরে কিছু ফল রাখা ছিল, আর আমার সঙ্গে কিছু বিস্কুট ছিল—এ ছাড়া কাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। খিদের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে একটা অবসাদও এসে পড়ছে। কাল রাত্রে সব বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখেছি। তার মধ্যে একটাতে দেখলাম ইঁদুরের মতো দেখতে একটা অতিকায় জানোয়ার আমার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। তারপর একটা বিস্ফোরণের শব্দ আর একটা বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। আমি কিছুক্ষণ অবশ হয়ে পড়ে রইলাম। তখন থেকেই ঘরে একটা গন্ধ পাচ্ছি; এখন বুঝতে পারছি সেটা আসছে আমার ফায়ার প্লেসের ভিতর থেকে। চিমনি দিয়ে গন্ধটা ঘরে ঢুকছে।

www.BDeBooks.Com

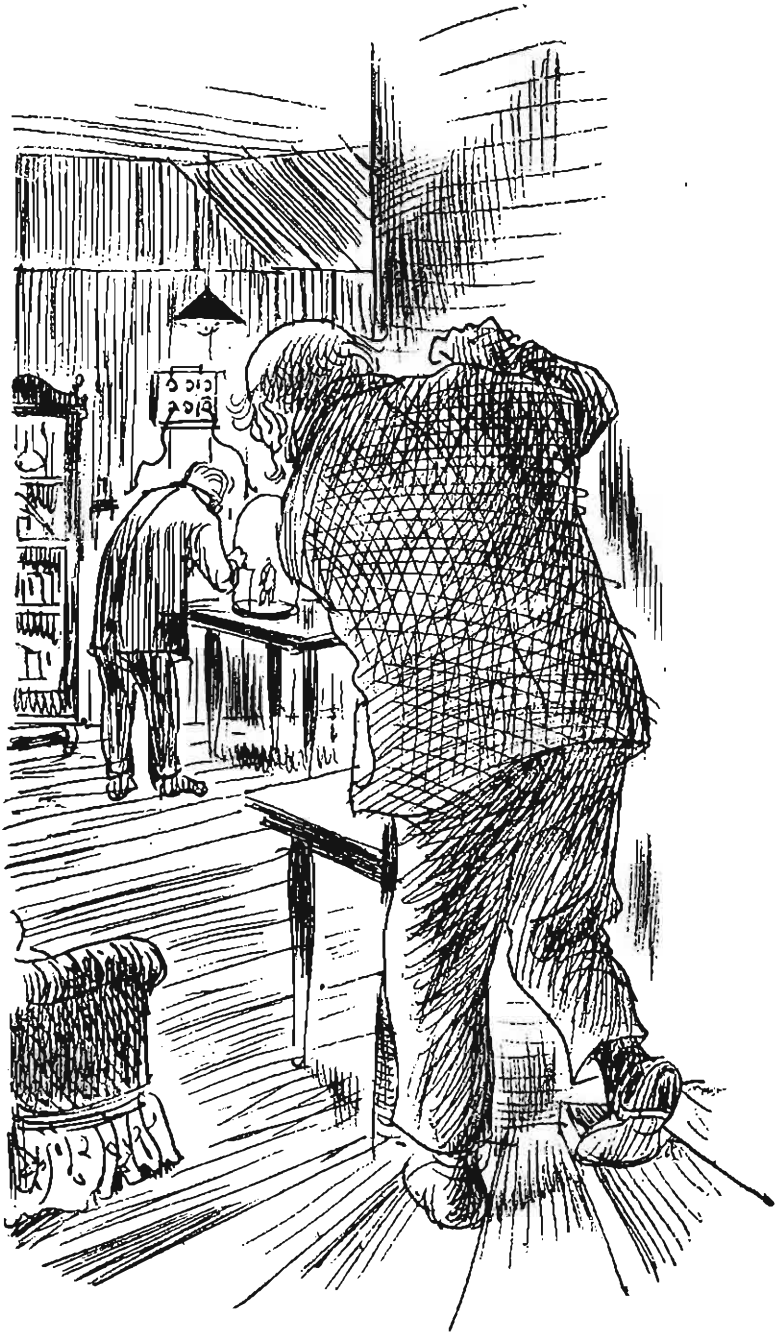

শুধু গন্ধ নয়। গন্ধের সঙ্গে বাষ্পের মতো কী যেন ঢুকে ঘরটাকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। আমার মাথাটাও কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। লিখতেও বেশ অসুবিধে হচ্ছে। আর বোধ হয় কলম—

৭ই জুন

আমি সুস্থ আছি বলব না তবে বেঁচে যে আছি এটাই বা কী কম আশ্চর্যের কথা? স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারওয়েজের ভারতগামী প্লেনে বসে ডায়রি লিখছি। ডিনারে ট্রাউট মাছ দিয়েছিল—খাইনি, লিন্ডকুইস্টের বাড়িতে খাওয়া কোনও কিছুই আর কোনওদিন খেতে পারব কি না জানি না। সুলিটেল্‌মার পুরো ঘটনাটা মন থেকে চিরকালের জন্য মুছে ফেলার কোনও বৈজ্ঞানিক উপায় আছে কি না সেটা গিরিডিতে গিয়ে ভেবে দেখতে হবে। যাই হোক আপাতত ঘটনাটা আমার এই ডায়রিতে লিখে রাখি কারণ এ ধরনের পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার একটা বিবরণ দেওয়া থাকলে আর কিছু না হোক, ভবিষ্যতে একটা ওয়ার্নিং-এর কাজ করতে পারে।

আমার ২৩শে মে-র বিবরণে ধোঁয়া আর গন্ধের কথা বলেছিলাম। গন্ধটা কখন যে আমাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল সেটা আমি টেরই পাইনি। জ্ঞান যখন হল তখন মনে হল আমি একটা বিশাল ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। ঘরের ছাতটা এতই উঁচুতে যে আমি যেন ভাল করে দেখতেই পাচ্ছি না। প্রথমে মনে হল আমি হয়তো কোনও গির্জার ভিতরে রয়েছি। কিন্তু তারপর ভাল করে দেখতে ছাতের কড়ি-বরগাগুলো চোখে পড়ল, আর সেগুলো যেন কেমন চেনা মনে হল।

যে জিনিসটার উপর শুয়ে আছি সেটা পিঠের তলায় কেমন নরম নরম মনে হচ্ছিল। তবে সেটা বিছানা নয়, কারণ সেটা স্থির থাকছিল না।

তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেলে আমার মাথাটা একটু ডান দিকে ঘোরাতেই একটা তীব্র আলোয় আমার চোখটা প্রায় ঝলসে গেল। সেই আলোটাও যেন অস্থির, মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়ছে, মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। একবার আলোটা সরে গিয়ে আমার চোখটা কিছুক্ষণ রেস্ট পাওয়াতে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম!

আলোটা আসছিল দুটো বিরাট গোল কাচ থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে। কাচের পিছনে জ্বল জ্বল করছে দুটো মসৃণ নীল চক্র—তার মাঝখানে আবার অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি কালো চক্র। এই কালো বিন্দু সমেত নীল চক্র দুটিও স্থির নয়—এদিক ওদিক নড়ছে, আর মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে। হ্যাঁ—চাইছেই বটে—কারণ ও দুটো আসলে চোখ। লিন্ডকুইস্টের চোখ। কাচ দুটো লিন্ডকুইস্টের সোনার চশমা। আমি শুয়ে আছি লিন্ডকুইস্টের দস্তানা পরা হাতের উপর। আর আমি আয়তনে হয়ে গেছি অন্য পুতুলগুলোরই মতো। অর্থাৎ, যা ছিলাম তার দশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু সাইজে ছোট হয়ে গেলেও, আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি কমেনি। কেবল বাঁ হাতের কাঁধের কাছটায় একটা যন্ত্রণা। বুঝলাম সেখানে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে।

লিন্ডকুইস্ট এবার আমার উপর ঝুঁকে পড়ল। তার গরম নিশ্বাস আমার শরীরের উপর অনুভব করলাম। এইবার তার ঠোঁটটা ফাঁক হতেই সোনার দাঁতটা ঝলমল করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধ, আরও উত্তপ্ত হাওয়া, লিন্ডকুইস্টের কথা—

'আমার 'হবি'-টা কেমন বলো তো, শঙ্কু? বেশ নতুন ধরনের—নয় কি? লোকে ডাকটিকিট জমায়, দেশলাইয়ের লেবেল জমায়, পুরনো টাকা জমায়, অটোগ্রাফের খাতায়

www.BDeBooks.Com

লোকের সই জমায়—আর আমি বাছাই করে দেশ বিদেশের বিখ্যাত লোকদের ধরে ধরে তাদের পুতুল করে কাচের ঢাকনা ঢেকে রেখে দিই। আমার এই অদ্ভুত শখ, এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জন্য কি কেউ উপাধি দেবে ? কেউ না !...তুমি বলবে, একজন বৈজ্ঞানিক তো আমার সংগ্রহে রয়েছে, তা হলে আর তোমাকে রাখা কেন। আসলে কী জান। বৈজ্ঞানিক বলে তোমাকে রাখছি না ; রাখছি ভারতীয় বলে। বিখ্যাত ভারতীয় আর চট করে ঘরের কাছে কোথায় পাব বলো? নরওয়েতে আর কজনই বা আসবে ? আর আমার এই আস্তানায় তো সকলে সব সময়ে আসতেই চায় না—যেমন তুমি এলে ?'

লিন্ডকুইস্ট দম নেবার জন্য একটু থামল। তারপর জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'আমার সবচেয়ে বড় গুণ কী জান ? আমি খুন করি না। এরা আসলে জ্যান্ত রয়েছে। দিনের বেলায় ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে এদের অসাড় করে রেখে দিই। রাত বারোটায় আবার শক্ দিয়ে জাগিয়ে ড্রপার দিয়ে খাইয়ে দিই। প্রয়োজন হলে তখন এদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলি। তবু আফশোষ এই যে এরা এত নির্ভাবনায় থেকেও কেউই খুশি থাকতে পারছে না। জ্ঞান হলেই সব কটাই 'আমাকে বাঁচাও, আমাকে উদ্ধার করো' ইত্যাদি বলে চেঁচাতে থাকে ! যেখানে খাওয়া পরার কোনও চিন্তা করতে হচ্ছে না, জীবনধারণের কোনও সমস্যার প্রশ্নই যেখানে উঠছে না, সেখানে পালাবার এত ইচ্ছের কারণটাই আমি বুঝতে পারছি না। তোমায় দেখে মনে হয় তুমি বেশ সহজেই পোষ মানবে—তাই নয় শঙ্কু ?'

লিন্ডকুইস্ট তার কথা শেষ করে আমাকে তার হাত থেকে নামিয়ে টেবিলের উপর শোয়াল। তারপর আমার কোমরে এবং বুকের ওপর এক জোড়া স্ট্র্যাপ আটকে বন্দি করে ফেলল।

আমি আপত্তি বা গায়ের জোর দেখানোর কোনও চেষ্টাই করলাম না—কারণ আমি জানতাম যে তাতে কোনও ফলই হবে না। এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখা, এবং আমার এই খুদে অবস্থায় কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে কী ভাবে লিন্ডকুইস্টকে সায়েস্তা করা যায় সেইটে ভেবে স্থির করা।

লিন্ডকুইস্ট বলেছে যে খুদে মানুষকে অসাড় পুতুলে পরিণত করতে হলে ইলেকট্রিকের শক্ দিতে হয়। আমাকে কিন্তু ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে লিণ্ডকুইস্ট বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না, কারণ আমার গেঞ্জির নীচে আমার সেই কার্বোথিনের পাতলা জামাটা রয়েছে। সেবার গিরিডিতে ঝড়ের মধ্যে আমার বাগানে গাছের চারাগুলো বাঁচাতে গিয়ে কাছাকাছি একটা তালগাছে বাজ পড়ায় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই এই জামাটা আবিষ্কার করি এবং ২৪ ঘণ্টা পরে থাকি।

লিন্ডকুইস্ট আমাকে শোয়ানো অবস্থায় রেখে ঘরের অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। এবারে দেখলাম ঘরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। তারপর একটা কাঠের টেবিল টানার শব্দ পেলাম। তারপর কাচের ঠুংঠাং আওয়াজ ! তারপর একটা সুইচ জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার গায়ের উপর একটা তীব্র আলো এসে পড়ল। তারপর দেখলাম লিন্ডকুইস্টের চশমার ঝলসানি। লিন্ডকুইস্ট আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

এবার তার দৈত্যের মতো হাতটা নেমে এল আমার দিকে, তাতে একটা ইলেকট্রিকের তার লক্ষ করলাম। লিন্ডকুইস্টের ঠোঁটের কোণে একটা বিশ্রী হাসি।

এবার তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে আবার সোনার দাঁতটা দেখা গেল আর চাপা কর্কশ স্বরে কথা এল, 'এসো বাছাধন, আমার সাত নম্বরের পুতুল ! এসো—'

ইলেকট্রিকের তার সমেত লিন্ডকুইস্টের ডান হাতটা আমার সমস্ত শরীরটাকে আচ্ছাদন করে ফেলল। আমার স্নায়ুর ভিতর একটা সামান্য শিহরনে বুঝতে পারলাম যে লিন্ডকুইস্ট

তারটা আমার গায়ে ঠেকিয়েছে। প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সে তারটাকে এইভাবে ঠেকিয়ে রেখে তারপর সেটাকে সরিয়ে নিল।

আমি মটকা মেরে মড়ার মতো পড়ে রইলাম।

ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। লিন্ডকুইস্ট আমার স্ট্র্যাপগুলো আলগা করে দিয়ে আমাকে হাতে তুলে নিল। আমি হাতপাগুলোকে টান করে রইলাম—যেন পুতুল হয়ে গেছি।

লিন্ডকুইস্ট আমাকে একটা নতুন টেবিলের উপর নতুন কাচের খাঁচার মধ্যে রেখে খাঁচার দরজায় চাবি দিয়ে গেল। ঘরের বাতি নিভে গেল। তারপর ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ভারী পায়ে উঠে যাওয়ার শব্দ পেলাম। গুপ্ত দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

এবার আমি হাত পা আলগা করলাম।

ঘরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। আমি হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই কাচের দেয়ালের সামনে পড়লাম। হাত দিয়ে ঠেলে দেখি সেটা রীতিমতো ভারী ; এক চুলও নড়ানো সম্ভব নয়। কাচের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে ভাবতে আরম্ভ করলাম। নরউইজিয় বুনো শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কাচের ঢাকনা আর টেবিলের মাঝখানে সামান্য যে ফাঁক রয়েছে সেইখান দিয়েই এই শব্দ আসছে, এবং এই চুল পরিমাণ ফাঁক দিয়েই যে হাওয়া ঢুকছে সেটাই আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট।

ওপরে বৈঠকখানা থেকে কুকু ক্লকের শব্দ শুনলাম—কুক্কু ! কুক্কু ! কুক্কু !

তিনটে বাজল। রাত না দিন তা বোঝার কোনও উপায় নেই। আধো আধো ঘুমের আমেজ অনুভব করলাম। পা দুটোকে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে গাটাকে এলিয়ে নিলাম। নিজের অবস্থার কথা ভাবতে হাসি পেল। আমি ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু—সুইডিস অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স কর্তৃক সম্মানিত বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিক—আজ একজন নরউইজিয় পাগলের হাতে পুতুল অবস্থায় বন্দি। গিরিডির কথা মনে পড়ছে—উশ্রী নদী, খাণ্ডুলি পাহাড়, আমার বাড়ি, আমার বেড়াল নিউটন, চাকর প্রহ্লাদ, আমার ল্যাবরেটরি। আমার বাগানের উত্তর দিকে সেই গোলঞ্চ গাছ, আমার কত অসমাপ্ত কাজ, কত গবেষণা, কত—

টুং টুং টুং !

ওটা কীসের শব্দ ? একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর থেকে উঠে আসতে গিয়ে থেমে গেল। আমি পা দুটোকে টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

টুং টুং—টুং টুং টুং—টুং টুং !

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার পাশের খাঁচা থেকে শব্দটা আসছে। অ্যাক্‌রয়েডের খাঁচা।

টুং টুং—টুং টুং টুং—টুং টুং !

এ কী ! এ যে মর্স কোড—টেলিগ্রাফের টরেটক্কার ভাষা ! আর এ ভাষা যে আমিও জানি !

আমিও কাচের গায়ে হাত ঠুকে জানালাম—'আবার বলো।'

আবার টুং টুং শব্দ হল। আমি মনে মনে তার মানে করতে লাগলাম। অ্যাক্‌রয়েড বলল, 'আমারও কার্বোথিনের পোশাক। আমি পুতুল সেজে আছি। তুমি যেদিন এলে—দেখে আনন্দ হল, ভয় হল, প্রকাশ করিনি।'

আমিও টুং টুং করলাম—'দ্বিতীয় দিন ? যখন একা ছিলাম ?'

'একা এসেছিলে ? দেখিনি। বোধ হয় ঘুমিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে ঘুমোনো অভ্যাস করেছি। সেদিন রাত্রে আর থাকতে পারলাম না—চেঁচাতে বাধ্য হলাম।'

'কদিন আছ এখানে ?'

www.BDeBooks.Com

'দু বছর। আমার মৃত্যুর সময় থেকেই। অনেক দেখেছি দু বছরে অনেক জেনেছি, অনেক ভেবেছি। এবার বোধ হয় পালাবার সুযোগ এসেছে।'

'মানুষ হয়ে ? না, পুতুল ?'

'মানুষ ! ওষুধ আছে। কাল রাত্রে খাবার সময় প্রস্তুত থেকো। আজ ক্লান্ত। হাত অবশ। ঘুমোব। গুড নাইট।'

আমি ধীরে ধীরে কাচে টোকা মেরে গুড নাইট জানিয়ে দিলাম। অ্যাক্রয়েড বেঁচে আছে—আমারই মতো। কার্বোথিনের ফরমুলা আমিই ওকে দিয়েছিলাম। কিন্তু পালানোর কী উপায় ও আবিষ্কার করেছে ? জানি না। আবার মানুষ হয়ে গিরিডিতে ফিরতে পারব ? অক্ষত দেহে ? জানি না। কপালে কী আছে কিছুই জানি না।

ভাবতে ভাবতে আমারও কখন ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙার পরেও বাকি সময়টা অন্ধকারেই কাচে ঠেস দিয়ে বসে কাটিয়েছি। কুকু ক্লকটা অনেকবার বেজেছে। প্রথমে সময়ের খেয়াল রেখেছিলাম, তারপর আর রাখিনি। অবশেষে এক সময় রাত বারোটা যে বাজল সেটা গুপ্ত দরজা খোলার শব্দ থেকেই বুঝলাম। শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সোজা হয়ে পুতুলের ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ালাম।

লিন্ডকুইস্ট ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। একটা গুনগুন শব্দ শুনে বুঝলাম সে গান গাইছে। তারপর খুট শব্দ করে ঘরের বাতিটা জ্বলে উঠল। আমি মাথা না ঘুরিয়ে আড় চোখে যতদূর দেখা যায় তাই দেখার চেষ্টা করলাম।

লিন্ডকুইস্ট কিন্তু আমাদের টেবিলের দিকে এল না। সে ঘরের পিছনের দিকে আরেকটা দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে গেল এবং সেখানেও একটা বাতি জ্বলে উঠল। আমি আবার আরেকটু সাহস করে অ্যাক্রয়েডের দিকে চাইলাম।

অ্যাক্রয়েড আমায় দেখে একটু হাসল ! তারপর ডান পকেটে ঢোকানো হাতটা আস্তে আস্তে বার করল। তারপর হাতটা আমার দিকে তুলে ধরল। দেখি তার হাতে একটা ছোট্ট আধ ইঞ্চি লম্বা ইঞ্জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ।

অ্যাক্রয়েডের এর পরের কাজ আরও বিস্ময়কর। সে সিরিঞ্জটা পকেটে পুরে তার খাঁচার দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে চাবির গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে দরজাটা খুলে গেল। অ্যাক্রয়েড দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আমার তো দম বন্ধ হবার জোগাড়। লিন্ডকুইস্ট যদি ফিরে আসে ? অ্যাক্রয়েড যেন সে বিষয়ে কোনও চিন্তা না করেই টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে খাঁচার পিছন দিকটায় এসে এদিকে সেদিক দেখে টেবিল থেকে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা আত্মহত্যা করছে নাকি ? না তা নয়। একটা ইলেকট্রিকের তার টেবিলের পিছন দিয়ে গিয়ে মাটিতে ঠেকেছে—অ্যাক্রয়েড টেবিলের থেকে অব্যর্থ লক্ষ্য করেই ঝাঁপটা দিয়েছে এবং তারটা ধরে সে মেঝের দিকে নামছে। অ্যাক্রয়েড যে বেশ সুস্থ সবল লোক ছিল সেটা আমি জানতাম—কিন্তু এই দুরূহ জিমনাস্টিকের কাজটাও যে তার আয়ত্তে থাকতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না।

তার বেয়ে মাটিতে নেমে অ্যাক্রয়েড খোলা দরজা দিয়ে একবার উঁকি মেরে অন্য ঘরটায় চলে গেল। ঘরটা থেকে যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসছে সেটা আমি এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এবার শুনতে পেলাম ! এটা তো মানুষের গলার শব্দ নয় ! তবে এটা কী ? আমার পক্ষে এ শব্দ চেনা অসম্ভব।

শব্দটা বন্ধ হবার পর লিন্ডকুইস্টের পায়ের আওয়াজ পেলাম। সে বাতি নিভিয়ে আমাদের ঘরটায় ফিরে এল। দরজাটার সামনেই এক নম্বর খাঁচা। লিন্ডকুইস্ট চাবি বার করে খাঁচার দরজা খুলে ইতালীয় গায়ক বাতিস্তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি কাঠের

মতো দাঁড়িয়ে আড়চোখে একবার লিন্ডকুইস্টের দিকে, একবার পাশের ঘরের দরজাটার দিকে চাইতে লাগলাম।

যথারীতি বাতিস্তার চিৎকার হল। অ্যাক্‌রয়েড পাশের ঘরে কী করছে না করছে ভেবে ঠাহর করতে চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ছফুট লম্বা দেহ নিয়ে ঝড়ের মতো প্রবেশ করে আমার বন্ধু অ্যাক্‌রয়েড লম্ফ দিয়ে এগিয়ে এসে লিন্ডকুইস্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি খাঁচার মধ্যে বন্দি, তার উপর দৈর্ঘ্যে মাত্র ছ' ইঞ্চি—অ্যাক্‌রয়েডকে যে সাহায্য করব তার কোনও উপায় নেই!

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝলাম যে অ্যাক্‌রয়েডের সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। লিন্ডকুইস্টের সাধের এক নম্বরের পুতুল হাতে থাকাতে প্রথমত সেইটিকে পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতেই অ্যাক্‌রয়েড তাকে জাপটে ধরে ফেলল।

লিন্ডকুইস্ট কিছু করতে পারার আগেই দেখি অ্যাক্‌রয়েড একটা সিরিঞ্জ নিয়ে নরউইজিয়ের বাঁ হাতের কোটের আস্তিনের উপর দিয়েছে প্রচণ্ড খোঁচা।

তারপর? তারপরের দৃশ্য আরও ভয়াবহ, আরও অবিস্মরণীয়। কয়েক মুহূর্ত আগেই অ্যাক্‌রয়েডকে দেখেছিলাম তারই সমান একটি জোয়ান লোককে জাপটে ধরতে—আর এখন দেখলাম অ্যাক্‌রয়েডের বাঁ হাতের মুঠোয় লিন্ডকুইস্টের ছ ইঞ্চি লম্বা একটি পুতুলের সংস্করণ!

অ্যাক্‌রয়েড অবজ্ঞাভরে পুতুলটিকে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে তার গায়ে বৈদ্যুতিক তারটা ঠেকিয়ে সেটাকে অসাড় করে দিল।

তারপর আমার খাঁচার দিকে এসে কাচের ঢাকনা তুলে ফেলে তার পকেট থেকে সেই ছোট্ট আধ ইঞ্চি সিরিঞ্জটা বার করে আমায় দিয়ে বলল, 'এত ছোট জিনিসটা তুমিই ভাল করে হ্যান্ডল করতে পারবে। এটা নিয়ে ফেলো।'

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে ইঞ্জেকশনটা নিয়ে নিজের আয়তনে ফিরে এলাম। কিন্তু এই ওষুধ অ্যাক্‌রয়েড পেল কী করে?

প্রশ্ন করতে অ্যাক্‌রয়েড আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সুইচ টিপতেই ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

ঘরের মাঝখানে প্রায় ছাত অবধি উঁচু একটা বিরাট কাচের খাঁচা। পাশের ঘরের পুতুলের খাঁচার মতোই দেখতে কিন্তু ভিতরে বিখ্যাত মানুষের বদলে রয়েছে একটি অতিকায় ইঁদুর জাতীয় জানোয়ার।

আমি পরম বিস্ময়ে অসাড় জন্তুটির দিক থেকে অ্যাক্‌রয়েডের দিকে চাইতেই সে বলল—'বোধ হয় অনুমান করতে পারছ জানোয়ারটা কী? এটা লেমিংএর একটা অতিকায় সংস্করণ; আসল লেমিং-এর চেয়ে দশগুণে ছোট। কিছুদিন থেকেই লিন্ডকুইস্ট এই নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে—বড় জিনিসের ছোট সংস্করণের মতো ছোট জিনিসের বড় সংস্করণ জমিয়ে রাখার শখ হয়েছিল বোধ হয়। সফল যে হয়েছে সেটা কালকেই জানতে পেরেছিলাম হান্‌স-এর সঙ্গে লিন্ডকুইস্টের কথাবার্তা থেকে। এবং ওই ওষুধই যে আমাদের আসল চেহারায় ফিরিয়ে আনতে পারবে, এটা তখনই আন্দাজ করেছিলাম।'

আমি অন্যান্য পুতুলগুলো দেখিয়ে বললাম—'এদের কী হবে?'

অ্যাক্‌রয়েড মাথা নেড়ে বলল, 'এদের তো আর কার্বোথিনের জামা ছিল না, তাই এরা মানুষ অবস্থায় আর বাঁচতে পারবে না। এদের মৃত বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। চলো, যাওয়া যাক।'

আমরা ঘোরানো সিঁড়ির দিকে রওনা দিলাম। অ্যাক্‌রয়েডকে গম্ভীর দেখে কেমন জানি

www.BDeBooks.Com

সন্দেহ লাগল। জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি দেশে ফিরে যাবে ?'

অ্যাক্‌রয়েড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার স্মৃতিসভা হয়ে গেছে তা জান ? আমার স্ত্রী বিধবার পোশাক পরেছে। আমার নামে আমার টাকা থেকে একটা স্কলারশিপ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় দেশে ফিরে যাওয়া একটু বেখাপ্পা হবে না কি ?'

'তা হলে তুমি কী করবে ?'

'একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। লেমিংদের সঙ্গে এখনও ভাল পরিচয় হয়নি। আর কয়েকদিন পরেই ওদের সমুদ্রযাত্রা শুরু হবে। আমিও সেই দলে ভিড়ে পড়ব ভাবছি। একটা সামান্য প্রাণী যদি নির্ভয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তো আমি পারব না কেন ?'

১২ই জুন

গিরিডিতে ফেরার চার ঘণ্টা পর এ ডায়রি লিখছি। একটা কথা লেখা দরকার—কারণ সেটা এর আগের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ফিরে আসার পর থেকেই লক্ষ করছিলাম আমার চাকর প্রহ্লাদ আমার দিকে বারবার কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে। এখন তার কারণটা বুঝতে পেরেছি। আমার যে জুতোটা গিরিডিতে রেখে গিয়েছিলাম সেটা পরতে গিয়ে দেখি পায়ে ছোট হচ্ছে। তারপর কালো কোটটা পরতে গিয়ে দেখি আস্তিনটা সামান্য ছোট। তখন আমার হাইটটা মাপতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

লিন্ডকুইস্টের ওষুধ আমাকে ঠিক আগের আয়তনে ফিরিয়ে না এনে আমাকে আগের চেয়ে দু' ইঞ্চি লম্বা করে দিয়েছে।

সন্দেশ। ফাল্গুন ১৩৭১

প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক-রহস্য

৭ই এপ্রিল

অবিনাশবাবু আজ সকালে এসেছিলেন। আমাকে বৈঠকখানায় খবরের কাগজ হাতে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'ব্যাপার কী ? শরীর খারাপ নাকি ? সকালবেলা এইভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না !'

আমি বললুম, 'এর আগে কখনও এইভাবে বসে থাকিনি তাই দেখেননি।'

'কিন্তু কারণটা কী ?'

'একটা নতুন যন্ত্র নিয়ে প্রায় দেড় বছর একটানা কাজ করে কাল সকালে সেটার কাজ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। তাই ঠিক করেছি সাত দিন বিশ্রাম নেব।'

অবিনাশবাবু একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনাকে পই পই করে

বলছি এবার রিটায়ার করুন। আরে মশাই, বিজ্ঞানেরও তো একটা শেষ আছে—নাকি মানুষ অনাদি অনন্তকাল ধরে একটার পর একটা নতুন গবেষণা চালিয়েই যাবে ?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আমার তো তাই বিশ্বাস। মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নেই।'

'মানুষের না থাকলেও, আপনার জিজ্ঞাসার অন্তত সাময়িক বিরতি আছে দেখে খুশি হলুম। চলুন, বেড়িয়ে আসি।'

কাজের সময় অবিনাশবাবু এসে পড়লে রীতিমতো ব্যাঘাত হয়। অযথা আজেবাজে প্রশ্ন করেন, টিটকিরি দেন, আর আমার সূক্ষ্ম গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কাজগুলো পণ্ড করার নানান ছেলেমানুষি চেষ্টা করেন। এতে যে উনি কী আনন্দ পান তা জানি না। তবে ভদ্রলোক আমার প্রায় পঁচিশ বছরের প্রতিবেশী, তাই সবই সহ্য করি।

আজ যখন হাত খালি, তখন কিন্তু অবিনাশবাবুর সঙ্গটা খারাপ নাও লাগতে পারে। হাজার হোক, রসিক লোক। আর আমাকে ঠাট্টা করলেও আমার অমঙ্গল কামনা করেন এমন কখনই মনে হয়নি। তাই অবিনাশবাবুর প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

গিরিডিতে বেড়াবার কথা বললে উশ্রীর ধারটাই মনে হয়, কিন্তু অবিনাশবাবু দেখি চলেছেন উলটো দিকে অর্থাৎ তাঁর বাড়ির দিকে। ব্যাপার কী ? কী মতলব ভদ্রলোকের ?

কিছুদূর যাবার পরে অবিনাশবাবু নিজেই কারণটা বললেন—'আজ একটা খেলনা পেয়েছি। সেটা আপনাকে দেখাব।'

'খেলনা ?'

'চলুন না। দেখলে আপনারও লোভ লাগবে—কিন্তু আপনাকে দেব না সেটি।'

মনে মনে বললাম—'খেলনার বয়স আপনার হয়তো থাকতে পারে—কিন্তু আমার কি আর আছে ?'

অবিনাশবাবু তাঁর বাড়িতে পৌঁছে সোজা নিয়ে গেলেন তাঁর বৈঠকখানায়। সেখানে একটা কাচের আলমারির সামনে নিয়ে গিয়ে তার দরজাটা খুলে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'দেখুন।'

আলমারির উপরের তাকে দেখি অনেক রকম গ্রাম্য খেলনা সাজানো রয়েছে—কেষ্টনগরের মাটির পুতুল, পোড়ামাটি ও চিনেমাটির জন্তু জানোয়ার, শোলার গাছ ও পাখি, কাশীর বাঘ ও আরও কত কী। আর এসবের মাঝখানে রয়েছে একটি মসৃণ বল। অবিনাশবাবুর আঙুল সেই বলের দিকেই পয়েন্ট করেছে।

'কেমন লাগছে আমার বলটা ?'

বলের মতোই মসৃণ গোল জিনিসটা—তবে সেটা যে কীসের তৈরি তা বোঝা মুশকিল আর তার রংটা বর্ণনা করা বেশ কঠিন। কিছুটা মেটে, কিছুটা সবুজ, কিছুটা আবার হলদে আর লাল মেশানো একটা পাঁচমিশালি রং বলা যেতে পারে। বেশ মজা লাগল দেখতে বলটাকে।

আমার ইন্টারেস্ট দেখে অবিনাশবাবুর যেন বেশ খুশি খুশি ভাব হয়েছে বলে মনে হল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কোথায় তৈরি ? কোত্থেকে পেলেন ?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'প্রথমটির উত্তর জানা নেই। দ্বিতীয়টি খুব সহজ। কাল উশ্রীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি বালির ওপর একটা জলঢোঁড়া সাপ মরে পড়ে আছে। সাপটাকে দেখছিলুম, হাতখানেক দূরেই যে বলটা পড়ে আছে সেটা প্রথমে লক্ষ করিনি। যখন করলুম, তখন এত ভাল লাগল যে তুলে নিয়ে এলুম। একবার হাতে নিয়ে দেখবেন ? ওজন আছে বেশ।'

www.BDeBooks.Com

অবিনাশবাবু খুব সাবধানে তাক থেকে বলটা নামিয়ে আমার হাতে দিলেন। সত্যিই বেশ ভারী। আর রীতিমতো ঠাণ্ডা। সাইজে একটা টেনিস বলের দ্বিগুণ। কিন্তু হাতে নিয়েও বুঝতে পারলাম না সেটা কীসের তৈরি। মাটির ভাগ হয়তো কিছুটা আছে—কিন্তু তার সঙ্গে বোধ হয় আরও কিছু মেশানো আছে।

কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে বলটা ফেরত দিয়ে বললুম, 'বেশ ইন্টারেস্টিং জিনিস।'

অবিনাশবাবু আলমারির ভেতর বলটা রাখতে রাখতে বললেন, 'হুঁ হুঁ! তা হলে স্বীকার করুন যে আপনি ছাড়া অন্য লোকের কাছেও আশ্চর্য জিনিস থাকতে পারে! যাকগে, এবার চলুন সত্যিই একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বেশ মেঘলা মেঘলা দিনটা করছে।'

ঘণ্টা দু-এক পরে বাড়িতে ফিরে এসে আর একবার আমার নতুন যন্ত্রটাকে দেখে এলাম। এ যন্ত্র সম্বন্ধে বাইরে জানাজানি হলে আবার নতুন করে যে সম্মান পাব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি—মাইক্রোসোনোগ্রাফ। প্রকৃতির সব সূক্ষাতিসূক্ষ্ম শব্দ, যা মানুষের কানে আজ অবধি কখনও শোনা যায়নি এমনকী যার অনেক শব্দের অস্তিত্বই মানুষে জানত না—সেই সব শব্দ এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার শোনা যায়।

কাল পিঁপড়ের ডাক শুনেছি এই যন্ত্রে। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। কতকটা ঝিঁঝির ডাকের মতন, তবে ওরকম একটানা একঘেয়ে নয়। অদ্ভুত বিচিত্র সুরের ওঠানামা, স্বরের তারতম্য—সব কিছুই আছে ওই পিঁপড়ের ডাকে। আমার তো মনে হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতে আমি পিঁপড়ের ভাষাও বুঝতে পারব। আর শুধু পিঁপড়ে কেন? এতে প্রকৃতির এমন কোনও সূক্ষ্ম শব্দ নেই যা শোনা যায় না। একটা knob আছে, সেইটে ঘুরিয়ে এর ওয়েভলেংথ পরিবর্তন করা যায়। এবং এই ঘোরানোর ফলেই বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত আওয়াজগুলো ধরা পড়তে থাকে!

আমি বাড়ি ফিরে এসে একটা বিশেষ ওয়েভলেংথে knob-টা সেট করে, আমার বারান্দার টবের গোলাপগাছের একটা ফুল ছিঁড়তেই অতি তীক্ষ্ণ বেহালার স্বরের মতো একটা আর্তনাদ আমার যন্ত্রটায় ধরা পড়ল। এটা যে ওই গাছেরই যন্ত্রণার শব্দ সেটা ভাবতেও অবাক লাগে।

অবিনাশবাবু আমাকে তাঁর বল দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন। আমার যন্ত্রটার বাহাদুরির দু-একটা নমুনা দেখলে না জানি তাঁর মনের অবস্থা কী হবে!

১২ই এপ্রিল

আজ সকালে আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফটা দেখানোর জন্য অবিনাশবাবুর কাছে আমার চাকর প্রহ্লাদকে পাঠাব ভাবছিলাম—এমন সময় দেখি ভদ্রলোক নিজেই এসে হাজির।

তাঁর চোখমুখের ভাব এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের রকম দেখে মনে হল তিনি বেশ উত্তেজিত। আমি তখন যন্ত্রটা আমার বাগানের ঘাসের ওয়েভলেংথের সঙ্গে মিলিয়ে আমার মালির ঘাস কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের সমবেত চিৎকার শুনছি। অবিনাশবাবু আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকে হাতের লাঠিটা দড়াম করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে টিনের চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লেন। তারপর একটা বড় নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, 'আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট করছেন—আর এদিকে আমার বাড়িতে যে তাজ্জব কাণ্ড চলেছে!'

অবিনাশবাবুর তাচ্ছিল্যের সুরটা মোটেই ভাল লাগল না। গলার স্বরটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'কী কাণ্ড?'

'শুনবেন কী কাণ্ড ? আমার সেই বল—মনে আছে ?'

'আছে।'

'কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় রং বদলাচ্ছে।'

'কী রকম ?'

'এত ধীরে বদলাচ্ছে, যে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু আপনি যদি এখন দেখে আবার দু ঘণ্টা বাদে গিয়ে দেখেন, তা হলে চেঞ্জটা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। আমি তো নাওয়াখাওয়া ভুলে গিয়ে ক'দিন থেকে এই করছি।'

'এখন কী রকম দেখলেন ?'

'এখন তো সকাল। সকালের চেহারা সেদিনের সকালের চেহারার মতোই। এখন যদি দেখেন তো সেদিনের মতোই দেখবেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে গেলে দেখবেন একেবারে অন্যরকম। সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার শুরু হয় সন্ধে থেকে। কী রকম একটা সাদা সাদা ছোপ পড়তে থাকে। পরে মাঝরাত্তিরে যদি দেখেন তো দেখবেন একেবারে ধপধপে সাদা। যেন একটা জায়ান্ট সাইজ ন্যাফথ্যালিনের বল !'

'ভারী আশ্চর্য তো।'

'ভাবছি খবরের কাগজে একটা খবর পাঠিয়ে দিই। তবু এই গোলক রহস্যের জোরে যদি কিছুটা খ্যাতি হয়। জীবনে তো কিছুই হল না। চাইকী, জাদুঘরের জন্য গভর্নমেন্টকে বেচে যদি দুপয়সা করে নেওয়া যায়, তাই বা মন্দ কী ?'

অবিনাশবাবুর কথা শুনে বুঝলাম তিনি আকাশকুসুম দেখছেন। মুখে বললাম, 'এসব করার আগে একবার জিনিসটা নিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখলে হত না ? হয়তো দেখবেন চোখের ধাঁধা কিংবা আপনার দেখার ভুল।'

অবিনাশবাবু এবার যেন রীতিমতো রেগে উঠলেন। তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে লাঠিটা বগলদাবা করে নিয়ে বললেন, 'ভুল তো ভুল। আপনি থাকুন আপনার হাতুড়ে কারবার নিয়ে। আমি দেখি আমার বলের দৌলত কতখানি।'

এর প্রত্যুত্তরে আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ভদ্রলোক হন্‌হনিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলের দিকে অনুভব করলাম যে বলটা সম্পর্কে আমারও মনের কোণে কেমন যেন একটা কৌতূহল উঁকি দিচ্ছে।

আমার যন্ত্রটা তখন একটু গণ্ডগোল করছে—বোধ হয় ভিতরে কোনও কনট্যাক্টের গোলমাল হয়ে থাকবে। সেটাকে পরে শোধরাব স্থির করে অবিনাশবাবুর বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দেখি ভদ্রলোক তাঁর বৈঠকখানার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটা চিঠি লিখছেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন—'দেখুন তো মশাই ভাষাটা কেমন হয়েছে। এটা আনন্দবাজারকে লিখেছি। —'সবিনয় নিবেদন, আমি সম্প্রতি একটি আশ্চর্য গোলক সংগ্রহ করিয়াছি যাহার তুল্য বস্তু পৃথিবীতে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। গোলকটির একাধিক বিস্ময়কর গুণ আছে। যথা, ইহা কোন পদার্থের সংমিশ্রণে নির্মিত তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব (স্থানীয় বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বরবাবু মহাশয়ও এ ব্যাপারে আমার সহিত একমত)। গোলকটির দ্বিতীয় গুণ—ইহার বর্ণ আপনা হইতেই প্রহরে প্রহরে পরিবর্তিত হয়। তৃতীয়ত'—কেমন হচ্ছে ?'

'বেশ তো। তৃতীয় গুণটি কী ?'

'ওইটেই এখন লিখছি। সেটা হল—মাঝে মাঝে বলটাকে ধরলে কেমন ভিজে ভিজে

www.BDeBooks.Com

মনে হয়। এখন দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

অবিনাশবাবু চিঠি লেখা বন্ধ করে আমাকে তাঁর আলমারির কাছে নিয়ে গেলেন। এবারে দেখলাম ভদ্রলোককে চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলতে হল। খুলে বললেন, 'হাত দিয়ে দেখুন, ভিজে টের পাবেন। আর ওই দেখুন কেমন সাদার ছোপ ধরতে আরম্ভ হয়েছে।'

আমি ডান হাতটা বাড়িয়ে বলটা ছুঁতেই আমার শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। আসলে আর কিছুই না—দেখলাম যে বলটা শুধু ভিজে নয় একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা।

অবিনাশবাবু বললেন, 'সেদিনের চেয়ে তফাত দেখলেন তো ? এবার বলি কী, কিছুক্ষণ আরও থেকে অন্তত আরও কিছুটা পরিবর্তন দেখে যান। আমি ভেতরে বলে দিচ্ছি—আপনার রাত্রের খাওয়াটা এখানেই সারুন, কেমন ?'

গোলকের রূপান্তর দেখে সত্যিই আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। তাই অবিনাশবাবু অনুরোধ না করলে আমি নিজেই হয়তো আরও কিছুক্ষণ থেকে যাওয়ার প্রস্তাব করতাম।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে বলের রং-পরিবর্তন স্টাডি করে এই কিছুক্ষণ হল বাড়ি ফিরেছি। অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছি তখন রাত সাড়ে এগারোটা। বলের চেহারা তখন সত্যিই একটা অতিকায় ন্যাফথালিনের গোলার মতো। আমার ইচ্ছে ছিল বলটাকে অন্তত একবার একদিনের জন্য আমার কাছে এনে সেটাকে নিয়ে একটু গবেষণা করি—কিন্তু অবিনাশবাবু নাছোড়বান্দা। আমার উপর টেক্কা দেওয়ার সুযোগ কি সহজে ছাড়েন তিনি ! তাঁর বিশ্বাস—গিরিডিতে আমিও থাকি, তিনিও থাকেন ; অথচ আমারই কেবল জগৎজোড়া নামডাক হবে, আর তিনি অখ্যাত থেকে যাবেন—এটা ভারী অন্যায়।

কাল একবার দুপুরের দিকে বলের চেহারাটা দেখে আসতে হবে।

১৩ই এপ্রিল

আজ অবিনাশবাবু একটি গামছায় মুড়ে বলটাকে আমার কাছে দিয়ে গেছেন। আপাতত সেটা আমারই ল্যাবরেটরিতে একটা টেবিলের উপর কাচের ছাউনির তলায় সযত্নে রাখা হয়েছে। সারাদিন ধরে প্রাণ ভরে এর রং পরিবর্তন লক্ষ করছি।

অবিশ্যি অবিনাশবাবু এলেন নাটকীয় ভাবেই ! তিনি যখন গামছার পুঁটলি হাতে আমার বৈঠকখানায় ঢুকলেন, তখন তাঁর মধ্যে গতকালের উৎফুল্লতার লেশমাত্র ছিল না বরং যে ভাবটা ছিল সেটা তার বিপরীত। যেন তিনি একটা অন্যায় করে ফেলেছেন এবং তার জন্য তাঁকে একটা বিশেষরকম মানসিক ক্লেশ ও অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

আমি তখন সবে কফি খাওয়া শেষ করছি। অবিনাশবাবু ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর বলসমেত গামছাটি রেখে ধুতির খুঁটে কপালের ঘাম মুছে বলছেন, 'না মশাই, আমাদের এসব জিনিস হ্যান্ডল করা পোষায় না। এ রইল আপনার কাছে। কলকাতা থেকে সাংবাদিক এলে আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেব।'

আমি বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, 'কী হল ? এক রাতের মধ্যে এমন কী হল যে এত সাধের বলের উপর একেবারে বিতৃষ্ণা এসে গেল ?'

'আর বলবেন না মশাই ! এ বল অতি সাংঘাতিক বল—একেবারে শয়তান বল। জানেন, আলমারিটার মাথার উপর একটা টিকটিকি ছিল—সকালে দেখি মরে আছে। শুধু তাই নয়—আলমারির ভেতর থেকে ডজন খানেক মরা আরশোলা বেরিয়েছে।'

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, 'বিনি পয়সায় এমন একটা ইন্‌সেক্‌টিসাইড পেয়ে

গেলেন, আর আপনি তাই নিয়ে আফশোষ করছেন ?'

'আরে মশাই, শুধু ইন্‌সেক্‌ট হলে তো কথাই ছিল না ! আমার নিজেরই যে কেমন জানি গা গুলোনো ভাব হচ্ছে।'

'দিন রাত জেগে বলটার রং বদলানো লক্ষ করছিলেন না ?'

'তা করেছি।'

'তার মানেই ঘুমের অভাব হয়েছে—তাই নয় কি ?'

'তা হয়েছে।'

'তবে ? গা গুলোনোর কারণ তো পরিষ্কার।'

'কী জানি মশাই। হতে পারে। কিন্তু তাও বলছি—এ বল আপনার কাছেই থাক। কেমন জানি উৎসাহ চলে গেছে—বুঝছেন না ?'

আমি মনে মনে যা বুঝলাম তা হল এই—অবিনাশবাবু তো বিজ্ঞান মানেন না—তিনি যেটা মানেন সেটা হল কুসংস্কার। বলটার কাছাকাছি কটা পোকামাকড় মরতে দেখেই তাঁর ধারণা হয়েছে যে বলটার মধ্যে বুঝি কোনও শয়তানি শক্তি লুকানো আছে।

তবে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কোনও কারণ নেই। আমার দিক থেকে দেখলে ঘটনাটা লাভজনকও বটে। তাই আমি দ্বিরুক্তি না করে বলটা রেখেই দিলাম।

এখন রাত সাড়ে বারোটা। সকাল আটটা থেকে কাচের ঢাকনার বাইরে থেকে বলটার রং-পরিবর্তন স্টাডি করছি। সকালে মেটে, সবুজ, লাল, আর হলদে রঙের খেলা। দুপুরের

www.BDeBooks.Com

দিকে লাল আর হলদেটে কমে আসে, সবুজটা আরেকটু গাঢ় হয়। বিকেলের দিকে সবুজটা ক্রমশ লাল আর কমলার দিকে যেতে থাকে। তারপর যত সন্ধ্যা হয়—সেটা হয়ে আসে টকটকে লাল—যেন বলটা একটা পাকা আপেল।

সন্ধ্যা সাতটা থেকেই লক্ষ করছি বলের সমস্ত রং চলে গিয়ে কেমন যেন একটা ছাই ছাই রুক্ষ ভাব নেয়। দশটা নাগাদ সেই ছাই রঙের উপর সাদার ছোপ পড়তে থাকে।

এখন বলটা একেবারে ধপধপে ঝকঝকে সাদা। তারপর তার উপর আমার দেড়শো পাওয়ার ইলেকট্রিক লাইট পড়েছে যেন তা থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কাচের ছাউনির ভেতরে একটা আবছা কুয়াশার মতো কী যেন জমা হচ্ছে বরফ থেকে বাষ্প বেরিয়ে যে রকম হয় কতকটা সেইরকম।

কালকের দিনটাও এর রং-পরিবর্তন স্টাডি করে, পরশু বলটাকে আমার টেবিলের উপর ফেলে এর একটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করার ইচ্ছে।

১৪ই এপ্রিল

কাল সারারাত নিউটনটা কেঁদেছে। বলটা আনার পর থেকেই লক্ষ করছি তার মেজাজটা যেন কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে! কাল সারাদিনে অনেকবার দেখেছি সে একদৃষ্টে বিরক্তভাবে কাচের ঢাকনাটার দিকে চেয়ে আছে। কী কারণ কে জানে।

ঘুমের অভাবেই বোধ হয়—আমার মাথাটাও কেমন জানি একটু ধরেছিল। তাই ল্যাবরেটরিতে যাবার আগে আমার তৈরি সেই বড়ির একটা খেয়ে নিলাম। দুশো সাতাত্তর রকমের ব্যারাম সারে আমার তৈরি এই 'অ্যানাইহিলিন' ট্যাবলেটের গুণে।

আমার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে প্রথমে একটা জিনিস লক্ষ করলাম। কতগুলি কাচের বৈয়ামের মধ্যে আমার ছোট ছোট পোকামাকড়ের একটা সংগ্রহ ছিল—ইচ্ছে ছিল মাইক্রোসোনোগ্রাফে তাদের ভাষা শুনে রেকর্ড করব। এখন দেখি প্রত্যেক বৈয়ামের প্রত্যেকটি পোকা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

এটা অবিশ্যি আমার ভুলেই হয়েছে। বলের এই মারাত্মক ক্ষমতার কথা জেনেও সেগুলোকে সরিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। কী আর করি! মরা পোকাগুলোকে ফেলে দিয়ে খালি বৈয়ামগুলো যথাস্থানে রেখে দিলাম।

এবার বলটার দিকে চেয়ে দেখি—গত কদিন সকালে যে রকম রং দেখেছি আজও ঠিক সেইরকম। রং বদলানোর নিয়মের কোনও পরিবর্তন নেই দেখে আশ্বস্ত হলাম। এ জিনিসটা বেনিয়মে বা খামখেয়ালি ভাবে হলে গবেষণার খুব মুশকিল হত।

কাচের ঢাকনার গায়ে বাষ্প জমে কাচের সর্বাঙ্গ বিন্দু বিন্দু জলে ভরে গিয়েছিল। আমি তাই ঢাকনাটা তুলে সেটা পরিষ্কার করতে গেছি। এমন সময় ল্যাবরেটরির দরজার দিক থেকে একটা শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি, নিউটন দরজার চৌকাঠের উপর পিঠ উঁচিয়ে লেজ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার দৃষ্টি বলের দিকে।

নিউটন যে একটা লম্ফ দেওয়ার জোগাড় করছে সেটা আমি দেখেই বুঝেছিলাম, এবং আমি সেটার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম। লাফটা দিতেই আমি বিদ্যুদ্বেগে বলটার সামনে গিয়ে থপ্ করে দুহাতে বেড়ালটাকে ধরে নিলাম। তারপর তাকে ল্যাবরেটরির বাইরে বার করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

বাকি যেটুকু সময় ল্যাবরেটরিতে ছিলাম, দরজায় নিউটনের আঁচড়ের শব্দ পেয়েছি। সামান্য একটা মাটির বলের উপর বেড়ালের এ আক্রোশ ভারী রহস্যজনক।

আজ সারাদিন আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফ চালিয়ে নানান সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শব্দের চার্ট করেছি, আর সে সমস্ত শব্দই আমার টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করেছি ! এই শব্দ সংগ্রহ শেষ হলে পর, শব্দের মানে করার পর্ব শুরু হবে। অবিনাশবাবু বলছিলেন বিজ্ঞানের নাকি একটা সীমা আছে। হায়রে ! কত যে জানবার বিষয় এখনও পড়ে আছে জগতে, অবিনাশবাবু তার কী বুঝবেন ?

www.BDeBooks.Com

এখন রাত একটা। এবারে ঘুমোতে যাব। কিছুক্ষণ থেকেই যন্ত্রটার কথা ছেড়ে বার বার বলটার কথা মনে হচ্ছে।

ওই যে রং পরিবর্তনের ব্যাপারটা—ওটার মধ্যে কীসের জানি একটা ইঙ্গিত রয়েছে। কীসের সঙ্গে যেন ওর একটা সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্যটা যেন আমার ধরতে পারা উচিত, কিন্তু আমি পারছি না। সাদা অবস্থায় বলটা যদি বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তা হলে অন্য অবস্থাগুলো কী ? সবুজ, লাল, হলদে, কমলা—এগুলো তা হলে কীসের রং ? এই রং পরিবর্তনের কারণ কী ? আমিই যদি না বুঝলাম তা হলে বুঝবে কে ?

হয়তো কাল থেকে গবেষণার কাজ শুরু করলে ওর রহস্য ধরা পড়বে। হয়তো ব্যাপারটা আসলে অত্যন্ত সহজ। ক্রমাগত জটিল জিনিস নিয়ে মাথা ঘামালে, অনেক সময় সহজ সমস্যার সামনে পড়ে মানুষের কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমার মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও এটা অসম্ভব নয়।

যাকগে। আজ আর ভাবব না। কাল দেখা যাবে।

১৫ই এপ্রিল

আমার জীবনে যত বিচিত্র, বীভৎস, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটেছে, অন্য কোনও বৈজ্ঞানিকের জীবনে তেমন ঘটেছে কি ? জানি না। এক এক সময় মনে হয় আমি সাহিত্যিক হলে এসব ঘটনা আরও সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু তার পরেই আবার মনে হয় যে অত গুছিয়ে লেখার দরকার কী ?

আমি তো আর বানানো কাল্পনিক ঘটনা লিখছি না—আমি লিখছি ডায়রি। সোজা কথায় সরলভাবে আমার জীবনে যা ঘটেছে তাই লিখছি। সেখানে অত ভাষার ব্যবহারের প্রয়োজন আছে কি ?

যাই হোক এবার যথাসম্ভব পরিষ্কার করে ঠাণ্ডা মাথায় এই কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনাটি লেখার চেষ্টা করা যাক।

কাল রাত্রে ডায়রি লেখা শেষ করে বিছানায় শুয়ে তারপর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আমি কাল লিখেছিলাম, যে এই রং বদলানোর মধ্যে বিশেষ যেন একটা ইঙ্গিত ছিল যেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে ওটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে একটা আলো দেখতে পেলাম। পরপর রঙের পরিবর্তনগুলো আর একবার ঝালিয়ে নিলাম মনের মধ্যে। মাঝরাত্তিরে বলটা সাদা তারপর সকালের দিকে ক্রমে সাদাটা চলে গিয়ে হলদে লাল সবুজ ইত্যাদি বেশ একটা জমকালো রঙের খেলা শুরু হয়। দুপুর যত এগিয়ে আসে তত সবুজটা গাঢ় হতে থাকে, হলদে লাল ইত্যাদি উজ্জ্বল রংগুলো কমে গিয়ে বলটা ক্রমশ একটা গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ চেহারা নেয়। তারপর বিকেলের দিকে সবুজ জায়গাগুলো আস্তে আস্তে লাল আর খয়েরি মেশানো একটা অবস্থায় পৌঁছে শেষ পর্যন্ত সন্ধের দিকে একটা ছাই ছাই ভাব এবং রাত বাড়লে পর সাদার ছোপ ধরা শুরু।

কীসের সঙ্গে মিল এই পরিবর্তনের ?

আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে—বৈঠকখানার দেয়ালের ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের উত্তরটা হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকের মতো আমার মাথায় এসে গেল।

আমাদের পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই বলের রং পরিবর্তনের আশ্চর্য মিল !

তফাত কেবল এই যে, পৃথিবীতে যে পরিবর্তন ঘটতে এক বছর লাগছে—এই বলের

সেটা ঘটতে লাগছে এক দিন, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা। রাত বারোটায় এই বলের চরম শীতের অবস্থা যখন এর সবটাই বরফের আবরণে ঢাকা। তারপর সেটা কমে গিয়ে সূর্যোদয়ের সময় থেকে লাল হলদে সবুজের খেলায় এর বসন্তকাল। সূর্য যতই মাথার উপরে উঠতে থাকে এই বল ততই গ্রীষ্মের দিকে এগোয় আর রঙের বাহারও কমে আসে। গ্রীষ্মের পর বিকেলের দিকে বর্ষা এলে বলটায় হাত দিলে ভিজে ভিজে ঠেকে। সূর্যাস্তের সময় থেকে এর শরৎ ; সন্ধ্যা বাড়লে প্রথম সাদার ছোপে হেমন্তকাল এবং সেই সাদা বেড়ে গিয়ে মাঝরাতে রাত বারোটাতে আবার চরম শীতের অবস্থা।

এই বলটি কি তা হলে আমাদের পৃথিবীরই একটা খুদে সংস্করণ ? নাকি, এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রহ—সেখানে ঋতু পরিবর্তন আছে, প্রাণ আছে, প্রাণী আছে ?

আমি জানি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসম্ভব বলে প্রায় কিছুই নেই—কিন্তু এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র গ্রহের কথা যে আমি পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

আমার চিন্তাধারা হয়তো অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলত—কিন্তু একটা অদ্ভুত শব্দের ফলে তার গতি ব্যাহত হল।

শব্দটা আসছে একতলা থেকে। সম্ভবত আমার ল্যাবরেটরি থেকেই।

নিউটন আজ আমার ঘরেই শুয়েছিল—সেও দেখি শব্দটা শুনেই কান খাড়া করে সোজা হয়ে উঠে বসেছে। ওর হাবভাব দেখে আমি ওকে কোলে তুলে নিলাম। তারপর ওকে নিয়ে একতলায় রওনা দিলাম ল্যাবরেটরির উদ্দেশে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই শব্দটা আমার কানে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'শঙ্কু ! শঙ্কু ! শঙ্কু !'

আমার নামটা ধরে কে যেন বারবার চিৎকার করে যাচ্ছে। উচ্চারণ স্পষ্ট হলেও, স্বর কিন্তু একেবারেই মানুষের স্বর নয় ; কিংবা মানুষ হলেও আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে এমন কোনও মানুষের মতো নয়।

ল্যাবরেটরির দরজা খুলে ঢুকতেই শব্দটা যেন চারগুণ বেড়ে গেল। আর নিউটনের সে কী প্রচণ্ড আস্ফালন। কোনওরকমে তাকে বগলদাবা করে এগিয়ে গেলাম আমার টেবিলের দিকে। শব্দটা আসছে আমার যন্ত্রটা থেকে—বলের দিক থেকে নয়।

আমি এসে দাঁড়াতেই চিৎকারটা থেমে গেল।

তারপর প্রায় আধমিনিট সব চুপচাপ। আমার বগলের তলায় বুঝতে পারলাম নিউটন থরথর করে কাঁপছে।

হঠাৎ আবার তীক্ষ্ণস্বরে সেই চিৎকার শুরু হল।

'টেরাটম্ ! টেরাটম্ ! টেরাটম্ গ্রহ থেকে বলছি ! কলির শঙ্কু ! কলির শঙ্কু ! তুমি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ ?'

আমি কী বলব ? আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করাই যে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

আবার প্রশ্ন এল—'শঙ্কু, আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ ? তোমার মাইক্রোসোনোগ্রাফ যে ওয়েভলেংথে রয়েছে সেই ওয়েভলেংথেই আমরা কথা বলছি। শুনতে পাচ্ছ তো 'হ্যাঁ' বলো—আরও কথা আছে।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললাম, 'পাচ্ছি শুনতে। কী বলবে বলো।'

উত্তর এল, 'আমরা তোমার ঘরে বন্দি। বুঝতে পারছি, তুমি না জেনে এ কাজ করেছ। কিন্তু করে অন্যায় করেছ। আমরা সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। কিন্তু তাতে তাচ্ছিল্য করার কোনও কারণ নেই ; পৃথিবীর চেয়ে পাঁচ-লক্ষগুণ বড় গ্রহও সৌরজগতের বাইরে রয়েছে। আমাদের শক্তি আমাদের আয়তনে নয়। আমাদের শক্তি আমাদের বিজ্ঞানে, আমাদের

www.BDeBooks.Com

বুদ্ধিতে। তোমাদের পৃথিবীর যা সম্পদ, সে অনুপাতে আমাদের টেরাটম্ গ্রহের সম্পদ লক্ষ গুণ বেশি। আমরা কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। জলের মধ্যে পড়েছিলাম, তাই আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ আমরা মাটির নীচে বাস করি। কিন্তু তোমার এই কাচের আচ্ছাদন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ অক্সিজেন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের যেমন এ জিনিসটা দরকার, তেমনি আমাদেরও। এমনিতে মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাত সামান্যই, তবে আমাদের বুদ্ধি অনেকগুণে বেশি, আর আয়তন আমাদের এতই ছোট যে তোমাদের সাধারণ মাইক্রোস্কোপে আমাদের দেখা যাবে না।' কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা থামল। আমি যে এরমধ্যে কখন চেয়ারে বসে পড়েছি তা নিজেই ঠাহর পাইনি। তারপর আবার কথা শুরু হল।

'তোমার কাছে আমাদের অনুরোধ কাচের আচ্ছাদন খুলে ফেলো। আমাদের আয়ু এমনিতেই কমে এসেছে। একটা আস্ত গ্রহের সমস্ত অধিবাসীদের হত্যা করার অপরাধের ভার কি তুমি সারা জীবন বইতে পারবে ? তাই অনুরোধ করছি—আমাদের মুক্তি দাও। তুমি বৈজ্ঞানিক। আমাদের সম্বন্ধে তোমার মনে কোনওরকম সহানুভূতির ভাব নেই ?'

একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছিল। এবারে সেটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনও ক্ষমতা আছে যাতে তোমরা তোমাদের চেয়ে আয়তনে অনেক বড় প্রাণীকেও হত্যা করতে পার ?'

কিছুক্ষণ কোনও উত্তর নেই। আমি বললাম, 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও। গত ক'দিনের মধ্যে তোমাদের কাছাকাছি কতগুলি প্রাণীর যে মৃত্যু হয়েছে—তার জন্য কি তোমরা দায়ী ?'

এবারে আমার প্রশ্নের উত্তরে একটা পালটা প্রশ্ন এল—'ভাইরাস কাকে বলে জান ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কাকে বলে ?'

আমার ভারী অপমান বোধ হচ্ছিল, তাও উত্তর দিলাম—'রোগবহনকারী বিষাক্ত বীজকে বলে ভাইরাস।'

'ঠিক। এই ভাইরাসের আয়তন কী ?'

'মাইক্রোস্কোপে দেখতে হয় !'

'ঠিক। কিন্তু এই বীজ থেকে একটা গোটা শহরের লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে সেটা জান ?'

'শুধু শহর কেন ? একটা সম্পূর্ণ দেশের লোকসংখ্যা লোপ পেয়ে যেতে পারে। মহামারীর কথা কে না জানে ?'

'ঠিক। এখনও কি বুঝতে পারছ না আমাদের ক্ষমতা কোথায় ?'

'তোমরা কি ভাইরাস ছড়িয়ে দাও ?'

'ছড়িয়ে দেব কেন ?'

'তা হলে ?'

কোনও উত্তর নেই। আমি অনুভব করলাম আমার ভেতরের জামাটা ঘামে ভিজে উঠেছে। একটা সাংঘাতিক সন্দেহ মনের মধ্যে জেগে উঠেছে।

এই গ্রহের অধিবাসীরা কি তা হলে এক একটি মূর্তিমান ভাইরাস ?

তাই যদি হয়, তা হলে এদের মুক্তি দিলে তো এরা সমস্ত পৃথিবীকে—'তিন মাসের মধ্যে।'

আমি চমকে উঠলাম। আমার কোন প্রশ্নের জবাব এরা দিচ্ছে ? আমি তো কোনও প্রশ্ন করিনি এদের !

এবারে একটা ক্ষীণ হাসির শব্দ পেলাম...সে হাসি এক অপার্থিব বিদ্রূপে ভরা। তারপর কথা এল...

'আমরা মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। তুমি ভাবছ সমস্ত পৃথিবীকে রোগাচ্ছন্ন করার শক্তি আছে কি না আমাদের। আমি উত্তরে বলেছি...আছে। শুধু তাই নয়...সমস্ত পৃথিবীকে তিন মাসের মধ্যে আমরা জনশূন্য করে দিতে পারি। সংক্রামক রোগের জন্য তো আর হাঙ্গামা করতে হয় না। আমাদের একজনের চেষ্টাতেই সমস্ত গিরিডি শহরটা ফাঁকা করে দিতে পারি। আর সকলে মিলে যদি একজোটে লাগি তা হলে...।'

গলার স্বরটা যেন কেমন ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেটা কি যন্ত্রের দোষ ?

আবার উত্তর এল...'না,. তোমার যন্ত্র ঠিক আছে। আমরাই দুর্বল হয়ে পড়েছি। কাচের ঢাকনা না খুললে আমরা আর বাঁচব না। আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে তুমি—প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু ; এই খুনের জন্য অবিশ্যি তোমাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না। কিন্তু বিবেক বলে কি তোমার কিছুই নেই। একজন বৈজ্ঞানিকের কি এতটা নিষ্ঠুরতা সম্ভব ? ভেবে দেখো শঙ্কু, ভেবে দেখো।'

'তোমাদের যদি মুক্তি দিই, তা হলে পৃথিবীতে মানুষের উপর থেকে তোমাদের আক্রোশ যাবে কি ? তোমাদের বিশ্বাস করব কী করে ?'

এ প্রশ্নের জবাব এল না। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর আমার যন্ত্রের ভিতর থেকে আসতে আরম্ভ করল এক বীভৎস আর্তনাদের কোরাস। কত কণ্ঠ সে কোরাসে মিলেছে জানি না। কিন্তু সেটা যে আর্তনাদ, এবং তাতে যে তীব্র যন্ত্রণার ইঙ্গিত রয়েছে তাতে কোনও ভুল নেই !

'শঙ্কু ! শঙ্কু !'

সমস্ত আর্তনাদ ছাপিয়ে আবার সেই কথা।

'শঙ্কু ! শঙ্কু ! শঙ্কু !'

'কী বলছ ?'

'কাচের ঢাকনা খুলে দাও, খুলে দাও ! আমরা মরতে চলেছি। আমাদের প্রাণ তোমার হাতে। হত্যার দায়ে পড়ো না। সারাটা জীবন বিবেকের জ্বালা...'

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল।

আমি যেমন চেয়ারে বসেছিলাম, তেমনই বসে রইলাম একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কর্তব্য কী সেটা বুঝতে পারছিলাম। কাচের ঢাকনা খোলা চলে না। টেরাটম্ গ্রহের প্রাণীদের বাঁচাতে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোকের জীবন বিপন্ন করা চলে না।

আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফে শব্দ কমে আসছে। কথা থেমে গেছে—এখন কেবল তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ !

সে আর্তনাদ ক্রমশ হাহাকারে পরিণত হল।

তারপর সে হাহাকারও মিলিয়ে গিয়ে রইল এক গভীর নিস্তব্ধতা।

আমি আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করে আমার যন্ত্রের সুইচটা বন্ধ করে দিলাম।

তারপর আস্তে আস্তে বলটার কাছে হেঁটে গিয়ে কাচের ঢাকনাটা তুলে ফেললাম।

ঘড়িতে ভোর পাঁচটার ঘণ্টা বাজছে।

কিন্তু টেরাটমে বসন্তের রং ধরেনি। তার বদলে একটা যেন মেটে রুক্ষতা।

আমি বলটাকে তুলে নিয়ে নিউটনের দিকে চাইলাম। সে-ও দেখি একদৃষ্টে বলটার দিকে

www.BDeBooks.Com

চেয়ে আছে। কিন্তু আগের সেই আক্রোশের কোনও ইঙ্গিত পেলাম না আর দৃষ্টিতে। আমি বললাম, 'তুই খেলবি বলটাকে নিয়ে ? নে খেল।'

বলটা মাটিতে রাখতে নিউটন এগিয়ে এল। তারপর তার ডান হাত দিয়ে মৃদু একটা আঘাত করতেই সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ ফেটে চৌচির হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল !

সন্দেশ। বৈশাখ ১৩৭২

প্রোফেসর শঙ্কু ও চী-চিং

১৮ই অক্টোবর

আজ সকালে সবে ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে ল্যাবরেটরিতে যাব, এমন সময় আমার চাকর প্রহ্লাদ এসে বলল, 'বৈঠকখানায় একটি বাবু দেখা করতে এয়েছেন।'

আমি বললাম, 'নাম জিজ্ঞেস করেছিস ?'

প্রহ্লাদ বলল, 'আজ্ঞে না। ইংরিজি বললেন। দেখে নেপালি বলে মনে হয়।'

গিয়ে দেখি খয়েরি রঙের ঝোলা কোট পরা এক ভদ্রলোক—সম্ভবত চিন দেশীয়। আর তাই যদি হয় তবে চিনা ভিজিটর আমার বাড়িতে এই প্রথম।

আমায় ঘরে ঢুকতে দেখেই ভদ্রলোক তাঁর সরু বাঁশের ছড়িটা পাশে রেখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমর অবধি ঝুঁকে আমায় অভিবাদন জানালেন। আমি নমস্কার করে তাঁকে বসতে বললাম এবং তাঁর আসার কারণটা জিজ্ঞেস করলাম।

ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে একেবারে ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করে হেসে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হে হে হে হে—ইউ ফলগেত, ইউ ফলগেত। ব্যাদ্ মেমলি, ব্যাদ্ মেমলি।'

ব্যাড মেমরি ? ফরগেট ? তবে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আগে কোথাও আলাপ হয়েছিল ? আমি কি ভুলে গেছি ? আমার স্মরণশক্তি তো এত ক্ষীণ নয়।

আমার অপ্রস্তুত ভাবটা বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ করে চিনা ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁর ঝোলা কোটের পকেট থেকে একটা লাল রঙের কাঠের বল বার করে সেটাকে ডান হাতের দুটো আঙুলের ফাঁকে রেখে আমার নাকের সামনে তিন চার পাক ঘোরাতেই সেটা সাদা হয়ে গেল। তারপর আবার একপাক ঘোরাতেই কালো—আর আমারও তৎক্ষণাৎ চার বছর আগের এক সন্ধ্যার ঘটনা পরিষ্কার ভাবে মনে পড়ে গেল।

এ যে সেই হংকং শহরের জাদুকর চী-চিং !

চিনতে না-পারার কারণ অবিশ্যি ছিল। প্রথমত চিনেদের পরস্পরের চেহারার প্রভেদ সামান্যই। তার উপর পরিবেশ আলাদা।—কোথায় হংকং, আর কোথায় গিরিডি ! আর ভদ্রলোকের আজকের পোশাকের সঙ্গে সেদিনের কোনও মিল নেই। সেদিন স্টেজে চী-চিং পরেছিলেন একটা সবুজ, লাল আর কালো নকশা করা ঝলমলে সিল্কের আলখাল্লা। আর তাঁর মাথায় ছিল ডোরাকাটা চোঙা-টুপি।

যাই হোক এই এক কাঠের বলের খেলা দেখে আমার মনে সেদিনের সমস্ত ঘটনা বায়োস্কোপের ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

আমি তখন যাচ্ছিলাম জাপানের কোবে শহরে পদার্থবিজ্ঞানীদের একটা সম্মেলনে যোগ দিতে। পথে হংকং-এ দুদিন থেকেছিলাম আমারই এক আমেরিকান বন্ধু প্রোফেসর বেঞ্জামিন হজকিন্‌স্‌-এর বাড়িতে।

হজকিন্‌স্‌ বৈজ্ঞানিক এবং ষাটের উপর বয়স হলেও ভারী আমুদে লোক। যেদিন পৌঁছোলাম, সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আমায় ধরে নিয়ে গেলেন চী-চিং-এর ম্যাজিক দেখাতে।

ম্যাজিক আমার ভাল লাগে তার একটা কারণ হচ্ছে, ম্যাজিকের কারসাজি ধরে ফেলার মধ্যে আমি একটা ছেলেমানুষি আনন্দ পাই। তা ছাড়া কোনও নতুন ধরনের ম্যাজিক দেখলে জাদুকরের বুদ্ধির তারিফ করতেও ভাল লাগে। উঁচুদরের জাদুকর মাত্রেরই বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব—এ সবই তাদের ঘাঁটতে হয়।

চী-চিং এর নাকি বেশ নামডাক আছে, তাই তিনি কী ধরনের জাদু দেখান সেটা জানার একটা আগ্রহ ছিল। হজকিন্‌স-এর অনুরোধ তাই এড়াতে পারলাম না।

হাতসাফাইয়ের কাজ, আলোছায়ার কারসাজি, যান্ত্রিক ম্যাজিক, রাসায়নিক ভেলকি এসবই চী-চিং ভালই দেখালেন। কিন্তু তারপর যখন হিপ্‌নোটিজম্‌ বা সম্মোহনের জাদু দেখাতে আরম্ভ করলেন, তখনই ব্যাপারটা কেমন যেন আপত্তিকর বলে মনে হতে লাগল। সবচেয়ে খারাপ লাগল যখন কতকগুলি নিরীহ গোবেচারা দর্শক বাছাই করে তাদের স্টেজের উপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চী-চিং নানান ভাবে তাদের অপদস্থ করতে শুরু করলেন। একটি লোক তো প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে আপেল মনে করে উলের বল চিবোলেন। আর একজন তাঁর পোষা কুকুর মনে করে বেশ করে একটা চেয়ারের হাতলে হাত বুলোতে লাগলেন। মোহ কাটবার পর দর্শকদের অট্টরোলে এইসব লোকেদের মুখের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়েছিল।

আমি হজকিন্‌সকে বললাম, 'আমার ভাল লাগছে না। লোকগুলো কি এইভাবে অপদস্থ হবার জন্য পয়সা দিয়ে ম্যাজিক দেখতে এসেছে?'

হজকিন্‌স বললেন, 'কী উপায় বলো? এদের ডাক দিলে এরা যদি স্টেজে যেতে আপত্তি না করে, তা হলে জাদুকরের উপর দোষারোপ করা যায় কী করে?'

আমি সবে একটা উপায়ের কথা ভাবছি, এমন সময় খেয়াল হল দর্শকরা সবাই যেন আমারই দিকে ঘুরে দেখছে। ব্যাপার কী?

স্টেজে চোখ পড়তে দেখি চী-চিং হাসি মুখে আমার দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন। চোখাচুখি হতে চী-চিং বললেন, 'আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, একবার স্টেজে আসবেন কি!'

বুঝলাম আমার চেহারা দেখে চী-চিং আমাকেও একজন নিরীহ গোবেচারা বলেই ধরে নিয়েছে। চী-চিংকে শিক্ষা দেবার একটা সুযোগ আপনা থেকেই এসে গেল দেখে আমি খুশি হয়েই স্টেজে উঠে গেলাম।

চী-চিং প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমাকে হিপ্‌নোটাইজ করার নানারকম চেষ্টা করলেন। চোখের সামনে আলোর লকেট দোলানো, চোখের পাতার উপর আঙুল বুলোনো, স্টেজে অন্ধকার করে কেবল নিজের চোখের উপর আলো ফেলে আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে চাওয়া, ফিসফিস করে গানের সুরে একঘেয়ে ও আবোলতাবোল বকে যাওয়া...এর কোনওটাই চী-চিং বাদ দিলেন না। কিন্তু এত করেও তিনি আমার উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন না। আমি যেই সজাগ সেই সজাগই রয়ে গেলাম।

www.BDeBooks.Com

অবশেষে বেগতিক দেখে ঘর্মাক্ত অবস্থায় স্টেজের সামনে এগিয়ে গিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ করে চাপা বিদ্রূপের সুরে চী-চিং বললেন, 'ভুলটা আমারই। যাকে হিপ্‌নোটাইজ করা হবে, তার মস্তিষ্ক বলে বস্তু থাকা চাই! এ ভদ্রলোকের যে সেটি একেবারেই নেই, তা আমার জানা ছিল না।'

দর্শকদের কাছে সেদিনকার মতো হয়তো চী-চিং-এর মান রক্ষা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর নিজের মনের অবস্থা কী হয়েছিল সেটা জানতে পারিনি, যদিও সেটা অনুমান করা কঠিন নয়।

পরের দিন হংকং ছেড়ে জাপানে চলে যাই।

ফিরতি পথে যখন আবার হংকং-এ নামি, তখন শুনি চী-চিং ম্যাজিক দেখাতে চলে গেছেন অস্ট্রেলিয়া।

তারপর এই চার বছর পরে আমার এই গিরিডির ঘরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ!

কিন্তু তাঁর আসার উদ্দেশ্যটা কী?

আমি প্রশ্ন করবার আগে চী-চিংই কথা বললেন।

'ইউ প্রোফেসল সোঁকু?'

উত্তরে জানালাম আমিই সেই ব্যক্তি।

'ইউ সায়ান্তিস্ত?'

'তাই তো মনে হয়।'

'সায়ান্স ইজ ম্যাজিক।'

'তা একরকম ম্যাজিকই বটে।'

'অ্যান্ড ম্যাজিক ইজ সায়ান্স! এঁ? হে হে হে।'

চী-চিং বার বার হাসছেন। আমি ক্রমাগত গম্ভীর থাকলে অভদ্রতা হয়, তাই এবার আমি তাঁর হাসিতে যোগ দিলাম।

'ইউ ওয়াল্‌ক্ হিয়াল?' অর্থাৎ, এটা কি তোমার কাজের জায়গা?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

তারপর চী-চিংকে নিয়ে গেলাম আমার ল্যাবরেটরি দেখাতে।

আমার আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি, আমার তৈরি ওষুধপত্র, আমার কাজের সরঞ্জাম, চার্ট ইত্যাদি দেখতে দেখতে চী-চিং বারবার বলতে লাগলেন, 'ওয়াঙ্গাফুল! ওয়াঙ্গাফুল।'

পাশাপাশি তিনটে বড় বড় বোতলে তরল পদার্থ দেখে চী-চিং বললেন, 'ওয়াতাল?' আমি হেসে বললাম, 'না জল নয়। এগুলো সব মারাত্মক অ্যাসিড।'

'অ্যাসিদ? ভেলি নাইস, ভেলি নাইস!'

অ্যাসিড কেন 'নাইস' হবে সেটা আমার বোধগম্য হল না!

দেখা শেষ হলে একটা চেয়ারে বসে পকেট থেকে একটা বেগুনি রুমাল বার করে ঘাম মুছে চী-চিং বললেন, 'ইউ আল্ গ্রেত্!'

চী-চিং-এর কথার প্রতিবাদ করে আর অযথা বিনয় প্রকাশ করলাম না, কারণ আমি যে 'গ্রেট' সেটা অনেক দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এর অনেক আগেই স্বীকার করেছেন।

'ইয়েস। ইউ আল্ গ্রেত্। বাত আই অ্যাম গ্রেতাল্!'

লোকটা বলে কী? কোথাকার কোন এক পেশাদার ম্যাজিশিয়ান, অর্ধেক সময় লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা নিচ্ছে...আর সে বলে কিনা আমার চেয়ে 'গ্রেটার'। কী এমন মহৎ কীর্তি তার রয়েছে যেটা পৃথিবীর আর পাঁচটা পেশাদার জাদুকরের নেই?

প্রশ্নটা মনে এলেও মুখে প্রকাশ করলাম না।

প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ আগেই কফি দিয়ে গিয়েছিল। চী-চিং দেখি কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছেন।

আমিও তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে উপর দিকে চাইতেই চী-চিং বলে উঠলেন, 'লিজাদ'। লিজার্ড...অর্থাৎ সরীসৃপ।

যেটাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলা হল, সেটা হল আমার ল্যাবরেটরির বহুকালের বাসিন্দা টিকটিকি।

জানোয়ারটির বাংলা নাম চী-চিংকে বলতে তিনি আবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

www.BDeBooks.Com

'তিকিতিকি ! হা হা ! ভেলি নাইস ! তিকিতিকি !'

দুই চুমুকে কফিটা শেষ করেই চী-চিং উঠে পড়লেন। তিনি নাকি কলকাতায় ম্যাজিক দেখাবেন সেই রাত্রেই—সুতরাং তাঁর তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। গিরিডি এসেছেন নাকি একমাত্র আমার সঙ্গেই দেখা করতে।

চী-চিং চলে যাওয়ার পর অনেক ভেবেও তাঁর আসার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না।

১৯ শে অক্টোবর

আজ দুপুরে আমার ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, এমন সময় আমার বেড়াল নিউটন এসে তড়াক করে আমার কাজের টেবিলের উপর উঠে বসল। এ কাজটা নিউটন কখনও করে না। টেবিলের উপরটা আমার গবেষণার নানান যন্ত্রপাতি ওষুধপত্রে ডাঁই হয়ে থাকে। সে আমার বাড়িতে প্রথম আসার কয়েকদিনের মধ্যেই একবার টেবিলে ওঠাতে আমার কাছে ধমক খেয়েছিল। তারপর থেকে আর দ্বিতীয়বার ধমকের প্রয়োজন হয়নি। আজ তাকে এভাবে নিষেধ অগ্রাহ্য করতে দেখে আমি বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর সামলে নিয়ে কড়া করে কিছু বলতে গিয়ে দেখি সেও চেয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে।

উপরে চেয়ে দেখি কালকের মতো আজও টিকটিকিটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নিউটন এ টিকটিকি ঢের দেখেছে এবং কোনওদিন কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করেনি। আজ সে পিঠ উঁচিয়ে লোম খাড়া করে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওটাকে চেয়ে দেখছে কেন ?

নিউটনকে ধরে নামিয়ে দেব মনে করে তার পিঠে হাত দিতেই সে এমন ফ্যাঁশ করে উঠল যে আমি রীতিমতো ভড়কে গেলাম।

টিকটিকির মধ্যে এমন কিছু কি সে দেখেছে যেটা মানুষের চোখে ধরা পড়ছে না ?

দেরাজ খুলে বাইনোকুলারটা বার করে সেটা দিয়ে টিকটিকিটাকে দেখলাম।

সামান্য একটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কি ? মনে হল পিঠের উপর লাল চাকা চাকা দাগটা যেন ছিল না। আর চোখের মধ্যে যে হলদের আভা—সেটাও কি আগে লক্ষ করেছি কোনওদিন ? বোধ হয় না। তবে এটা ঠিক এর আগে কোনওদিন বাইনোকুলার দিয়ে এত কাছ থেকে টিকটিকিটাকে দেখার প্রয়োজন হয়নি।

জানোয়ারটাকে নড়তে দেখে চোখ থেকে যন্ত্রটাকে সরিয়ে নিলাম।

টিকটিকিটা সিলিং বেয়ে দেয়ালে এসে নামল। তারপর দেয়াল বেয়ে নেমে এসে সুড়ুৎ করে আমার শিশিবোতলের আলমারিটার পিছনে ঢুকে গেল।

তাকে আর দেখতে না পেয়েই বোধ হয় নিউটনের উত্তেজনাটা চলে গেল। সে নিজেই টেবিল থেকে নেমে একটা গর্‌র্ গর্‌র্ আওয়াজ করতে করতে দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেল। আমিও টিকটিকির চিন্তা মন থেকে দূর করে আমার গবেষণার কাজ নিয়ে পড়লাম।

আপাতত আমার কাজ হচ্ছে একটি পদার্থ আবিষ্কার করা যেটার ছোট্ট একটা বড়ি পকেটে রাখলেই মানুষ শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা অনুভব করবে। অর্থাৎ 'এয়ার-কন্ডিশনিং পিল'।

আমার চাকর প্রহ্লাদ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আমার কাজ করছে। সে আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র কখনও ঘাঁটাঘাঁটি করে না। বাইরের লোকজন কদাচিৎ আমার বাড়িতে এলেও আমার ল্যাবরেটরিতে কখনই আসে না—এক বৈজ্ঞানিক না হলে, অথবা আমি নিজে না নিয়ে

এলে।

আমি যখন ল্যাবরেটরিতে থাকি না, তখন দরজা তালা দিয়ে বন্ধ থাকে। জানালাগুলোও ভিতর দিক থেকে ছিট্‌কিনি লাগানো থাকে।

কাল রাত্রেও দেখে গেছি যে আমার সেই ভীষণ তেজি অ্যাসিডের তিনটি বোতলই প্রায় কানায় কানায় ভর্তি।

আজ সকালে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই দেখি বাঁদিকের—অর্থাৎ কার্বোডায়াবলিক অ্যাসিডের বোতলটা প্রায় অর্ধেক খালি।

রাতারাতি যে অ্যাসিড বাষ্প হয়ে উবে যাবে তার কোনও সম্ভাবনা নেই। বোতলের গায়ে ফুটোফাটাও নেই যে চুঁইয়ে টেবিলে পড়ে শুকিয়ে যাবে। অ্যাসিড তবে গেল কোথায়? তিনটি অ্যাসিডের প্রত্যেকটিই এত তেজিয়ান যে সেগুলো নিয়ে কেউ অসতর্কভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

আমি বিস্তর মাথা ঘামিয়ে এই রহস্যের কোনও কূলকিনারা পেলাম না। অথচ অ্যাসিডের অভাবে আমার এক্সপেরিমেন্ট চালানো অসম্ভব।

এই অবস্থায় কী করা যায় সেটা ভাবছি এমন সময় একটা মৃদু খচমচ শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি আমার শিশিবোতলের আলমারির মাথায় উপর দিয়ে একটা প্রাণী উঁকি দিচ্ছে।

প্রাণীটি আমারই ল্যাবরেটরির সেই প্রায় পোষা টিকটিকি, কিন্তু এখন আর তাকে টিকটিকি বলা চলে না কারণ তার চেহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। চোখের মণিতে এখন আর কালো অংশ বলে কিছুই নেই, সবটাই হলদে এবং সেটা মোটেই স্নিগ্ধ হলদে নয়। বরঞ্চ তাতে কেমন যেন একটা আগুনের ভাঁটার আভাস আছে।

নাকেও একটা প্রভেদ লক্ষ করলাম। ফুটোগুলো আগের চেয়ে অনেক বড়।

গায়ের রং আগে ছিল হালকা সবুজ ও হলদে মেশানো। এখন দেখছি সর্বাঙ্গ লাল চাকাচাকায় ভর্তি।

আলমারির পিছনে টিকটিকির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি আমি না জানতাম, তা হলে মনে করতাম এ এক নতুন জাতের সরীসৃপ।

টিকটিকিটা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। ফোঁস বলছি এইজন্যে যে নিশ্বাসের শব্দটা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

আর একটা কথা বলা হয়নি—টিকটিকিটা লম্বায় আগের চেয়ে কিছু বেশি বলে মনে হল।

আমি তাকিয়ে থাকতেই সেটা আমার দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে টেবিলের দিকে চাইল।

তারপর আলমারির মাথার কোণটাতে এগিয়ে কিছুক্ষণ ওত পাতার ভঙ্গিতে চুপ করে থেকে হঠাৎ এক প্রচণ্ড লাফে একেবারে সোজা টেবিলের উপর এসে পড়ল। আমার কাচের যন্ত্রপাতি সব ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল।

আলমারি থেকে টেবিলের দূরত্ব প্রায় দশ হাত; তাই আমার কাছে এই বিরাট লংজাম্প এতই অপ্রত্যাশিত যে আমি কিছুক্ষণের জন্য একেবারে থ মেরে গেলাম।

টেবিলে এসে পড়াতে টিকটিকিটাকে এখন বেশ কাছ থেকেই দেখতে পেলাম। লেজটায়—এক লম্বায় বেড়ে যাওয়া ছাড়া, আর কোনও পরিবর্তন হয়নি। পা মাথা চোখ নাক গায়ের রং সবই বদলে গেছে। মাথার উপরটায় দুটো চোখের মাঝখানে লক্ষ করলাম একটা ছোট্ট শিঙের মতো কী যেন গজিয়েছে। আর পায়ের নখগুলো যেন অস্বাভাবিক রকম বড় ও তীক্ষ্ণ।

www.BDeBooks.Com

টিকটিকিটা আমার অ্যাসিডের বোতলগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে।

তারপর দেখলাম মুখটা হাঁ করে সে একটি লকলকে জিভ বার করল। জিভের ডগাটা সাপের জিভের মতো বিভক্ত।

এর পরের দৃশ্য এতই অবিশ্বাস্য যে আমার হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোনও উপায়ই রইল না।

টিকটিকিটা তরতর করে এগিয়ে গিয়ে কার্বোডায়াবলিক অ্যাসিডের বোতলটার গা বেয়ে উঠে পিছনের পা দুটো দিয়ে বোতলের কানাটা আঁকড়ে ধরে সমস্ত শরীরটা বোতলের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে ওই সাংঘাতিক অ্যাসিডের বাকিটুকু চক্‌চক্ করে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল।

খাওয়ার সময় লক্ষ করলাম বোতলের বাইরে দোলায়মান লেজটার চেহারা বদলে গিয়ে বাকি শরীরের সঙ্গে মানানসই হয়ে গেল এবং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল—'ড্র্যাগন্!'

চিনের ড্র্যাগন্!

আমার ঘরের প্রায় পোষা টিকটিকি আজ ড্র্যাগনের রূপ ধারণ করেছে, আর এই ড্র্যাগনের প্রিয় পানীয় হল আমার এই মারাত্মক অ্যাসিড!

বৈজ্ঞানিক বলেই বোধ হয় চোখের সামনে এমন একটা আশ্চর্য...প্রায় অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখে, এর পরে আরও কী ঘটতে পারে সেটা জানার একটা প্রচণ্ড কৌতূহল অনুভব করেছিলাম। যা ঘটল তা এই...

টিকটিকিটা অ্যাসিড খেয়ে ড্র্যাগনের রূপ ধরে বোতলের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আয়তনে প্রায় আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল। লক্ষ করলাম তার নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাকের ফুটো দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

টিকটিকিটা এবার চলল দ্বিতীয় বোতলের দিকে। এতে আছে নাইট্রোঅ্যানাইহিলিন অ্যাসিড।

বোতলের পিঠটায় সামনের দু-পা দিয়ে ভর করে উঠে এক কামড়ে ছিপিটা খুলে ফেলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই টিকটিকিটা আমার সমস্ত নাইট্রোঅ্যানাইহিলিন শেষ করে ফেলল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সাইজ হয়ে দাঁড়াল প্রায় তিন হাত।

দ্বিতীয় বোতল শেষ করে তৃতীয়টির দিকে এগোনোর সময় আমার মন বলে উঠল—আর না। এবারে এটাকে সায়েস্তা করার উপায় বার করতে হবে। হলই বা অ্যাসিডখোর; আমার মতো বৈজ্ঞানিকের হাতে কি একে ঘায়েল করার কোনও কল নেই?

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমি ঘরের কোনায় রাখা লোহার সিন্দুকটা থেকে আমার ব্রহ্মাস্ত্র, অর্থাৎ ইলেকট্রিক পিস্তলটা বার করলাম। তাগ করে মারলে একটি ৪০০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্ যে কোনও প্রাণীকে নিঃসন্দেহে ধরাশায়ী করবে। পিস্তলটি আবিষ্কার করার পর আজ পর্যন্ত এটার ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন হয়নি। আজ আমি এর শক্তি পরীক্ষা করব এই ড্র্যাগনের উপর।

ড্র্যাগন তখন সবে আমার ফোরোসোটানিক অ্যাসিডের বোতলের ছিপিটি খুলেছে। আমি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে পিস্তলটি উঁচিয়ে তার কাঁধের উপর তাগ করে ঘোড়া টিপতেই একটা বিদ্যুতের শিখা তিরের মতো গিয়ে লক্ষ্যস্থলে লাগল।

কিন্তু অবাক বিস্ময়ে এবং গভীর আতঙ্কে দেখলাম, যে শকে একটি আস্ত হাতি ভস্ম হয়ে যাবার কথা, সে শক্ এই সাড়ে তিন হাত (ড্র্যাগনটি আয়তনে ক্রমেই বেড়ে চলেছে) প্রাণীর কোনওই অনিষ্ট করতে পারল না! সামান্য একটু শিউরে উঠে ড্র্যাগন বোতল ছেড়ে প্রায় দশ সেকেন্ড তার হলুদ জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি অনুভব করলাম আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

তারপর ড্র্যাগনের নাক দিয়ে পড়ল নিশ্বাস, আর নিশ্বাসের সঙ্গে বেরোল রক্তবর্ণ ধোঁয়া। সেই তীব্র ঝাঁঝালো বিষাক্ত ধোঁয়ায় আমার দৃষ্টি ও চেতনা লোপ পেতে শুরু করল।

অজ্ঞান হবার আগের মুহূর্ত অবধি আমি দেখতে পেলাম ড্র্যাগন তার পায়ের আঘাতে ও লেজের আছড়ানিতে আমার টেবিলের সমস্ত যন্ত্রপাতি লণ্ডভণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করছে।

* * *

প্রহ্লাদের গলার আওয়াজে জ্ঞান হল।

'বাবু, বাবু!'

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি ল্যাবরেটরির চেয়ারে বসে আছি।

প্রহ্লাদ জিভ কেটে বলল, 'অ্যাই দ্যাখ—আপনি ঘুমিয়ে পড়লে, আমি বুইতে পাইনি!'

'কী হয়েছে?'

'সেই ন্যাপালি বাবু। তেনার লাঠিটা ফ্যালে গেলেন যে!'

'লাঠি?'

দরজার দিকে চোখ পড়তে দেখি হাসি মুখে চী-চিং দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর হাতে সেই সরু বাঁশের লাঠি।

'দিস্ তাইম, আই ফলগেত মাই স্তিক্। হে হে! ভেলি সলি!'

আমার মুখ দিয়ে কেবল বেরোল—'বাট দি ড্র্যাগন?'

'দাগন? ইউ সি দাগন?'

'আমার সমস্ত যন্ত্রপাতি...'

বলতেও লজ্জা করল—কারণ আমার টেবিলের জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু অ্যাসিড?

তিনটি বোতলই যে খালি।

আমি বিস্ফারিত নেত্রে খালি বোতলগুলোর দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় শুনলাম চী-চিং-এর খিলখিল হাসি।

'হি হি হি! এ লিত্‌ল্ ম্যাজিক—বাত গ্রেত ম্যাজিক!...ওই তোমার ড্র্যাগন।'

চী-চিং কড়িকাঠের দিকে আঙুল দেখালেন।

উপরে চেয়ে দেখি আমার চিরপরিচিত টিকটিকি তার জায়গাতেই রয়েছে।

'অ্যান্দ ইয়োল অ্যাসিদ!'

এবার টেবিলের দিকে চাইতেই চোখের নিমেষে তিনটি খালি বোতল স্বচ্ছ তরল পদার্থে কানা অবধি ভরে উঠল!

চী-চিং এবার বাঙালি কায়দায় দুটো হাতের তেলো একত্র করলেন।

'নোমোস্কাল, প্রোফেসাল সোঁকু।'

চী-চিং চলে গেলেন।

প্রহ্লাদ শুনলাম বলছে, 'ভাবলাম বেশ সরেস লাঠিখান—কাজে দেবে। ও মা—বাবু এই গেলেন আর এই এলেন। পাঁচ মিনিটও হয়নি।'

* * *

www.BDeBooks.Com

পুনশ্চ। ১৮ই অক্টোবর। ড্র্যাগনের ঘটনাটা ডায়রিতে লিখতে গিয়ে দেখি সেটা আগেই লেখা হয়ে গেছে—আমারই হাতের লেখায়। এটাও কি তা হলে চী-চিং-এর দুর্ধর্ষ ম্যাজিকের একটা নমুনা ?

সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৭২

প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা

৭ই সেপ্টেম্বর

আজ এক মজার ব্যাপার হল। আমি কাল সকালে আমার ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, এমন সময় চাকর প্রহ্লাদ এসে খবর দিল যে একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কে লোক জিজ্ঞেস করতে প্রহ্লাদ মাথা চুলকে বলল 'আজ্ঞে, সে তো নাম বলেনি বাবু। তবে আপনার কাছে সচরাচর য্যামন লোক আসে ঠিক তেমনটি নয়।'

আমি বললাম, 'দেখা না করলেই নয় ? বড় ব্যস্ত আছি যে।'

প্রহ্লাদ বলল, 'আজ্ঞে, বলতেছেন বিশেষ জরুরি দরকার। না দেখা করি যাইতে চায়েন না।'

কী আর করি, কাজ বন্ধ করেই যেতে হল।

গিয়ে দেখি একটি অতি গোবেচারা সাধারণ গোছের ভদ্রলোক, বছর ত্রিশেক বয়স, পরনে ময়লা খাটো ধুতি, হাতকাটা সার্টের চারটে বোতামের দুটো নেই, মুখে তিনদিনের দাড়ি, হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক ঢোক গিলে বললেন, 'আজ্ঞে, আপনি যদি দয়া করে একবার আমাদের বাড়িতে আসতে পারেন তো বড় ভাল হয়।'

আমি বললাম, 'কেন বলুন তো ? আমি তো এখন বিশেষ ব্যস্ত।'

ভদ্রলোক যেন আরও খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আপনি ছাড়া আর কার কাছে যাব বলুন। আমি থাকি ঝাঝায়। আমার ছেলেটার ব্যারাম—কী যে ব্যারাম তা বুঝতেও পারছি না। আপনি হলেন এ মুল্লুকের সবচেয়ে বড় ডাক্তার, তাই আপনার কাছেই—'

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনার একটু ভুল হয়েছে। আমি ডাক্তার নই, বৈজ্ঞানিক।'

ভদ্রলোক একেবারে যেন চুপসে গেলেন।

'ভুল হয়েছে ? বৈজ্ঞানিক ! ও, তা হলে বোধ হয় ভুলই হয়েছে। কিন্তু তা হলে কোথায় যাব বলুন তো ?'

'কেন, আপনাদের ওদিকে তো আরও অন্য ডাক্তার রয়েছেন।'

'তা আছে। তবে তারাও কিছু করতে পারল না আমার খোকার জন্য।'

'কী হয়েছে আপনার ছেলের ? কত বয়স ?'

'আজ্ঞে, ছেলের আমার চার পুরেছে গত জষ্ঠি মাসে। খোকা বলে ডাকি, ভাল নাম

অমূল্য। হয়েছে কী—এই সেদিন—এই গত বুধবার সকালে—আমার উঠোনের এক কোণে শেওলা ধরে ভারী পেছল হয়ে আছে—সেখানে খেলা করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মাথার এই বাঁ দিকটায় একটা চোট লাগল। খুব কান্নাকাটি করল খানিকটা। পরে দেখলাম মাথার ওইখানটা ফুলেওছে বেশ। ফোলা অবিশ্যি দুদিনেই কমে গেল, কিন্তু সে থেকে কী যে আবোলতাবোল বকছে তা বুঝতেই পারছি না। অমন কথা সে এর আগে কক্ষনও বলেনি বাবু! তবে কেমন যেন মনে হয়—বুঝতে পারি না—তবু মনে হয়—সে কথার যেন মানে আছে। তবে আমরা তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—পোস্টাপিসের কেরানি—আমরা তার মানে বুঝি না।'

'ডাক্তার বোঝেনি তার মানে?'

'আজ্ঞে না। আর সে ডাক্তার তো তেমন নয়, তাই ভাবলাম যে আপনার কাছে...।'

আমি বললাম, 'কেন, ঝাঝার ডাক্তার গুহ মজুমদারকে তো আমি চিনি। তিনি তো ভাল চিকিৎসক।'

তাতে ভদ্রলোক খুব কাতরভাবে বললেন, 'আমার কি তেমন সামর্থ্য আছে বাবু যে আমি বড় ডাক্তারকে ডাকব! আমায় সবাই বললে যে গিরিডির শঙ্কু ডাক্তারের কাছে যাও—তিনি দয়ালু লোক বিনি পয়সায় তোমার ছেলেকে ভাল করে দেবেন। তাই এলুম আর কী।'

লোকটিকে দেখে মায়া হচ্ছিল, তাই আমার ব্যাগ থেকে কুড়িটা টাকা বার করে দিয়ে বললাম, 'আপনি গুহ মজুমদারকে দেখান। তিনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলেকে ভাল করে দেবেন।'

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞভাবে টাকাটা পকেটে পুরে হাত জোড় করে মাথা হেঁট করে বললেন, 'আসি তা হলে। আপনাকে অযথা বিরক্ত করলুম—মাফ করবেন।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ ছেড়ে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এলাম। এরা আমাকে ডাক্তার বলে ভুল করল কী করে, সেটা ভেবে যেমন হাসি পাচ্ছে, তেমন অবাকও লাগছে।

১০ই সেপ্টেম্বর

সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠা আমার চিরকালের অভ্যাস। উঠে হাত মুখ ধুয়ে একটু উশ্রীর ধারে বেড়াতে যাই। আজ প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে দেখি ঝাঝার ডাক্তার প্রতুল গুহ মজুমদার ও সেদিনের সেই ভদ্রলোকটি আমার বৈঠকখানায় বসে আছেন। আমি তো অবাক। প্রতুলবাবু এমনিতে বেশ হাসিখুশি, কিন্তু আজ দেখলাম তিনি রীতিমতো গম্ভীর ও চিন্তিত। আমাকে দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে নমস্কার করে বললেন, 'আপনি তো মশাই বেশ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন, এ চিকিৎসা তো আমার দ্বারা সম্ভব নয় প্রোফেসর শঙ্কু!'

আমি প্রহ্লাদকে ডেকে কফি আনতে বলে সোফায় বসে প্রতুলবাবুকে বললাম, 'কী অসুখ হয়েছে বলুন তো ছেলেটির। কষ্টটা কী?'

'কোনও কষ্ট আছে বলে মনে হয় না।'

'তবে? মাথায় চোট লেগে ব্রেনে কিছু হয়েছে কি? ভুল বকছে?'

'বকছে, তবে ভুল-ঠিক বলা শক্ত। এখন পর্যন্ত এমন কিছু বলতে শুনিনি যেটাকে জোর দিয়ে ভুল বলা চলে। আবার এমন কিছু বলতে শুনেছি যেগুলো একেবারে অবিশ্বাস্য রকম ঠিক।'

'কিন্তু আমিই বা এ ব্যাপারে কী করতে পারি বলুন।'

www.BDeBooks.Com

প্রতুলবাবু ও অন্য ভদ্রলোকটি পরস্পরের দিকে চাইলেন। তারপর প্রতুলবাবু বললেন, 'আপনি একবার আমাদের সঙ্গে চলুন ! আমার গাড়ি আছে—একবার দেখে আসুন অন্তত। আমার মনে হয়—আর কিছু না হোক আপনার খুব আশ্চর্য ও ইন্টারেস্টিং লাগবে। সত্যি বলতে কী, কেউ যদি এর একটা কিনারা করতে পারে, তবে সেটা আপনিই পারবেন।'

খুব একটা জরুরি কারণ না থাকলে প্রতুলবাবু আমাকে এমন অনুরোধ করতেন না সেটা জানি। কাজেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গ নিতেই হল। ফিয়াট গাড়িতে করে গিরিডি থেকে ঝাঝা পৌঁছোতে আমাদের লাগল দু'ঘণ্টা।

পথে আসতে আসতেই জেনেছিলাম অন্য ভদ্রলোকটির নাম দয়ারাম বোস। সাত বছর হল ঝাঝার পোস্টাপিসে চাকরি করছেন। বাড়িতে স্ত্রী আছেন, আর ওই একটি মাত্র ছেলে অমূল্য ওরফে খোকা। বাড়িটাও দেখলাম ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে মানানসই। খোলার ছাতওয়ালা একতলা বাড়ি, দুটি মাত্র ঘর, আর একটা আট হাত বাই দশ হাত উঠোন—যে উঠোনে খোকা পিছলে পড়েছিল। পুব দিকে ঘরের একটা ছোট্ট খাটের উপর বালিশে মাথা দিয়ে 'খোকা' শুয়ে আছে। রোগা শরীর, মাথাটা আর চোখ দুটো বড়, চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই খোকা বলল, 'স্বাগতম্।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'তুমি সংস্কৃতে অভ্যর্থনা জানাতে শিখলে কী করে ?'

আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে খোকা কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'সিক্স অ্যান্ড সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ ?'

পরিষ্কার ইংরিজি উচ্চারণ—কিন্তু এ প্রশ্নের মানে কী ?

আমি দয়ারামবাবুর দিকে চেয়ে বললাম, 'এসব কথা ও কোত্থেকে শিখল ?'

দয়ারামের বদলে প্রতুলবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'যা বুঝছি ও যে সমস্ত কথা কদিন থেকে বলছে, তা ওকে কেউ শেখায়নি। ও নিজে থেকেই বলছে। সেইখানেই তো গণ্ডগোল। অথচ খাচ্ছেদাচ্ছে ঠিকই। ঘুমটা বোধ হয় একটু কমেছে। আমরা যখন বেরিয়েছি পাঁচটায় তখনই ও উঠে গিয়ে কথা শুরু করেছে।'

আমি বললাম, 'সকালে কী বলছিল ?'

এ প্রশ্নের উত্তর খোকা নিজেই দিল। সে বলল, 'করভাস্ স্প্লেন্ডেন্, পাসের ডোমেস্টিকাস্।'

আমার পিছনেই একটা চেয়ার ছিল ; আমি সেটায় ধপ্ করে বসে পড়লাম। এ যে আমাদের অতি পরিচিত সব পাখির ল্যাটিন নামগুলো বলছে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে যে সব পাখিকে প্রথম ডাকতে শুনি সেগুলোরই ল্যাটিন নাম হল এই দুটো। করভাস্ স্প্লেন্ডেন হল কাক আর পাসের ডোমেস্টিকাস্ হল চড়াই।

এবারে আমি খোকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে এসব নামগুলো কে শেখালে বলতে পার ?'

কোনও উত্তর নেই। সে একদৃষ্টে একটা দেয়ালের টিকটিকির দিকে চেয়ে রয়েছে। এবার বললাম, 'একটুক্ষণ আগে আমাকে দেখে যে কথাটা বললে সেটা কী ?'

'সিক্স, অ্যান্ড সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু সেটার—'

কথা শেষ করলাম না, কারণ আমার হঠাৎ খেয়াল হল আমার চশমার দুটো লেন্সের পাওয়ার হল মাইনাস সিক্স ও মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ !

এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আর আমার জীবনে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

এবার বিছানার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে খোকার উপর একটু ঝুঁকে পড়ে প্রতুলবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যথাটা মাথার ঠিক কোনখানটায় লেগেছিল বলুন তো ?'

প্রতুলডাক্তারের মুখ খোলার আগেই খোকাই জবাব দিল, 'অস্ টেম্পোরালে।'

নাঃ, একেবারে অবিশ্বাস্য অভাবনীয় ব্যাপার। মাথার হাড়ের ডাক্তারি নামও জেনে ফেলেছে এই সাড়ে চার বছরের ছেলে।

আমি ঠিক করলাম খোকাকে আমার বাড়িতে এনে কয়েকদিন রাখব, তাকে পর্যবেক্ষণ করব, পরীক্ষা করব। মানুষের ব্রেন সম্বন্ধে অনেক কিছু স্টাডি করা হয়তো এ থেকে সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমার হয়তো অনেক উপকারও হবে।

দয়ারাম ও প্রতুলবাবু দুজনেই আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন। খোকার মা কেবল বললেন, 'আপনি ওকে নিয়ে যেতে চান তো নিয়ে যান, কিন্তু দয়া করে ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটি করে আমাদের আবার ফেরত দিয়ে যাবেন। চার বছরের ছেলের চার বছরের বুদ্ধিই ভাল। ও যা কথা বলছে আজকাল, সে তো আর আমাদের সঙ্গে নয়, সে ওর নিজের সঙ্গে। আমরা ওর কথা বুঝিই না ! ছেলে যেন আর আমাদের ছেলেই নেই। এতে মনে বড় কষ্ট পাই, ডাক্তারবাবু। আমার ওই একমাত্র ছেলে, তাই আমাদের কথাটাও একটু ভেবে দেখবেন !'

এ রোগের ওষুধ আমারও জানা নেই তবে আমার মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মাথা খাটিয়ে চেষ্টা করলে এর একটা চিকিৎসা বার করা সম্ভব নয়—সেটাই বা ভাবি কী করে ? তবে মুশকিল হয়েছে কী, খোকার যে জিনিসটা হয়েছে সেটাকে ব্যারাম বলা চলে কি না সেখানেই সন্দেহ। তবু বুঝতে পারি ছেলে বেশি বদলে গেলে বাপমায়ের কখনও ভাল লাগে না—বিশেষ করে রাতারাতি বদলালে তো কথাই নেই।

ঝাঝা ছাড়লাম প্রায় দুপুর সাড়ে এগারোটায়। প্রতুলবাবুই পৌঁছে দিলেন। পথে সাতাশ মাইলের মাথায় গাড়িটা হঠাৎ একটু বিগড়ে থেমে গিয়েছিল, তাতে খোকা শুধু একবার বলে, 'স্পার্কিং প্লাগ'। বনেট খুলে দেখা যায় স্পার্কিং প্লাগেই গণ্ডগোলটা হচ্ছে, এবং সেটা ঠিক করাতেই গাড়িটা চলে। এ ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি, বা খোকাও কোনও কথা বলেনি।

কাল থেকেই খোকা আমার এখানে আছে। আমার দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় ওকে রেখেছি ! দিব্যি নিশ্চিন্তে আছে। বাড়ির কথা বা মাবাবার কথা একবারও উচ্চারণ করেনি। আমার বেড়ালের নাম নিউটন শুনে খোকা খালি বলল 'গ্র্যাভিটি'। বুঝলাম স্যার আইজ্যাক নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন সেটাও খোকা কী করে জানি জেনে ফেলেছে।

বেশিরভাগ সময় খোকা চুপচাপ খাটেই শুয়ে থাকে, আর কী জানি ভাবে। আমার চাকর প্রহ্লাদ তো ওকে পেয়ে ভারী খুশি। আমি যেটুকু সময় ঘরে থাকি না, সে সময়টুকু প্রহ্লাদ ওর কাছে থাকে। তবে খোকার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা চলে না এইটেতেই তার দুঃখ। আমার কাছে তাই নিয়ে আপশোস করাতে আমি বললাম, 'কিছুদিন এখানে থাকতে আশা করছি ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।' কথাটা বলেই অবিশ্যি মনে হল যে সেটা সত্যি হবে কি না আমার জানা নেই।

খোকার মাথাটা যাতে একটু ঠাণ্ডা হয় তার জন্য দুটো নাগাদ ওকে একটা ঘুম পাড়ানো বড়ি দুধে গুলে খেতে দিয়েছিলাম ! খোকা গেলাসটা হাতে নিয়েই বলল, 'সম্নোলিন।' অথচ দুধটা দেখে বা শুঁকে ওষুধের অস্তিত্বটা টের পাবার কোনও উপায় নেই। এদিকে আমি তো মিথ্যে কথা বলতে পারি না। ধরা যখন পড়েই গিয়েছি, তখন সেটা স্বীকার করেই বললাম,

www.BDeBooks.Com

'তোমার ঘুমোলে ভাল হবে। ওটা খেয়ে নাও।'

খোকা শান্ত স্বরে বলল, 'না, ওষুধ দিও না। ভুল কোরো না।'

আমি বললাম, 'তুমি কী করে জানলে আমি ভুল করেছি? তোমার কী হয়েছে তুমি জান?'

খোকা চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। আমি আবার বললাম, 'তোমার কি কোনও অসুখ করেছে? সে অসুখের নাম তুমি জান?'

খোকা কোনও কথা বলল না। এ প্রশ্নের উত্তর কোনওদিন তার কাছে পাওয়া যাবে কি না জানি না। দেখি বইপত্তর ঘেঁটে যদি কোনও কূলকিনারা করতে পারি।

আজ সকাল থেকে খোকার কথা ও জ্ঞানের পরিধি অসম্ভব বেড়ে গেছে।

কাল সারাদিন নানান ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক বই ঘেঁটেও খোকার এই অদ্ভুত 'ব্যারাম' সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। দুপুরবেলা আমার দোতলার স্টাডিতে বসে জুলিয়াস রেডেলের লেখা মস্তিষ্কের ব্যারামের উপর বিরাট মোটা বইটা একমনে পড়ছি, এমন সময় হঠাৎ খোকার গলা কানে এল—'ওতে পাবে না।'

আমি অবাক হয়ে মুখ তুলে দেখি সে কখন জানি তার ঘর থেকে উঠে চলে এসেছে। এর আগে এখানে এসে অবধি সে তার নিজের ঘরের বাইরে কোথাও যায়নি, বা যাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি।

আমি বইটা বন্ধ করে দিলাম। খোকার কথার মধ্যে এমন একটা স্থির বিশ্বাসের সুর, যে সেটা অগ্রাহ্য করার কোনও উপায় নেই। একজন ষাট বছর বয়সের বুদ্ধিমান বুড়ো যদি আমায় এসে গম্ভীর ভাবে বলত রেডেলের বইয়ে কোনও একটা জিনিস নেই, আমি হয়তো তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস নাও করতে পারতাম। কিন্তু সাড়ে চার বছরের খোকার কথায় আমার হাতের বইটা যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

খোকা কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বলল, 'টির‍্যানিয়াম্ ফসফেট।'

আশ্চর্য! একতলায় আমার ল্যাবরেটরিতে রাখা আমার তৈরি নতুন অ্যাসিডের নাম খোকা জানল কী করে। আমি বললাম, 'ভারী কড়া অ্যাসিড!'

খোকার মুখে যেন এই প্রথম একটু হাসির আভাস দেখলাম। সে বলল, 'ল্যাবরেটরি দেখব।'

এই সেরেছে। ওকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই আমার। এ অবস্থায় ওকে ওই সব কড়া কড়া অ্যাসিড, গ্যাস ইত্যাদির মধ্যে নিয়ে গেলে যে কখন কী করে বসবে তার কি ঠিক আছে? আমি তাই একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ওখানে গিয়ে কী হবে?—ধুলো, তা ছাড়া গন্ধও ভাল নয়। নানারকম আজেবাজে ওষুধপত্র।'

খোকা কিছু না বলে আবার পায়চারি শুরু করল। আমার টেবিলের উপর একটা গ্লোব ছিল, সেটা সে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। গ্লোবটায় সাউথ আমেরিকার একটা জায়গায় খানিকটা রং চটে গিয়েছিল, ফলে কিছু জায়গার নাম চিরকালের মতো সেটা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। খোকা কিছুক্ষণ সেই ছোট্ট রং ওঠা জায়গাটার দিকে চেয়ে থেকে, তারপর আমার টেবিলের উপর থেকে ফাউন্টেন পেন তুলে খুদে খুদে অক্ষরে সেই জায়গাটায় কী জানি লিখল। শেষ হলে পর গ্লোবটার উপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলাম লিখেছে Serinha, Jacobina, Campo, Formosa। এই ক'টি নামই গ্লোবটা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে নিয়ে আজ সারাদিন খোকা যে কত কী বলেছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

আইনস্টাইনের ইকুয়েশন, আমার নিজের পোলার রিপলেয়ন থিয়োরি, চাঁদে কোন উপত্যকা সব চেয়ে বড়, কোন পাহাড় সব চেয়ে উঁচু, বুধগ্রহের আবহাওয়ায় কেন এত কার্বনডায়ক্সাইড, এমনকী আমার ঘরের বাতাসে কী কী জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ সবই খোকা আউড়ে গেছে। এর ফাঁকে একটা আস্ত মাদ্রাজি গান গেয়েছে ও হ্যামলেট থেকে 'টু বি অর নট টু বি' আবৃত্তি করেছে। বিকেল চারটে নাগাদ আমি আমার ঘরে বসে কাজ করছিলাম, প্রহ্লাদ খোকার কাছে বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আর সেই ফাঁকে খোকা তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে প্রহ্লাদ ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখতে না পেয়ে আমার কাছে এসেছে। তারপর আমরা দুজনে নীচে গিয়ে দেখি সে আমার ল্যাবরেটরির তালা দেওয়া দরজাটা ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখছে।

আমি অবিশ্যি তাকে ধমকটমক কিছুই দিলাম না, কেবল ওর হাতটা ধরে বললাম, 'চলো, আমরা পাশের বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।' সে অমনি বাধ্য ছেলের মতো আমার সঙ্গে বৈঠকখানায় সোফায় গিয়ে বসল, আর ঠিক সেই সময়ই এসে পড়লেন আমার পড়শি অবিনাশবাবু।

তাঁর আবির্ভাবটা আমার কাছে খুব ভাল লাগল না, কারণ অবিনাশবাবু ভারী গপ্পে মানুষ ; খোকাকে দেখে এবং তার কীর্তিকলাপ শুনে যদি আর পাঁচজনের কাছে গল্প করেন তা হলে আর রক্ষে নেই। আমার বাড়িতে দেখতে দেখতে মেলা বসে যাবে, আর সেই মেলার প্রধান ও একমাত্র আকর্ষণ হবে খোকা।

বলা বাহুল্য, খোকাকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে অবিনাশবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'ইনি আবার কোত্থেকে আমদানি হলেন ? গিরিডি শহরে তো এনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না !'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'ও আমার কাছে এসে কিছুদিন রয়েছে। এক জ্ঞাতির ছেলে।'

অবিনাশবাবু বাচ্চাদের আদর করার মতো করে তাঁর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে খোকার গালে একটা টোকা মেরে বললেন, 'কী নাম তোমার খোকা, অ্যাঁ ?'

খোকা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'এক্টোমরফিক সেরিব্রেটনিক।'

অবিনাশবাবু চমকে উঠে দুচোখ বড় বড় করে বললেন, 'ও বাবা এ কোন দিশি নাম, ও অধ্যাপকমশাই !'

আমি একটু হেসে বললাম, 'ওটা ওর নাম নয় অবিনাশবাবু, ও যেটা বলল সেটা হচ্ছে আপনার বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা। ওর নাম আসলে, অমূল্যকুমার বসু, ডাকনাম খোকা।'

'বৈজ্ঞানিক নাম ?' অবিনাশবাবু দেখলাম বেশ অবাক হয়েছেন। 'আপনি আজকাল কচি খোকাদের ধরে ধরে ওই সব শেখাচ্ছেন নাকি ?'

এ কথার উত্তরে হয়তো আমি চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু আমার বদলে খোকাই মন্তব্য করে বসল।

'উনি আমায় কিছুই শেখাননি।'

এই বলেই খোকা চুপ করে গেল।

এরপরেই অবিনাশবাবু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চা কফি কিচ্ছু না খেয়ে উঠে পড়লেন। যে রকম ভাব নিয়ে গেলেন, তাতে আমার ভয় হচ্ছে উনি খোকার খবরটা না রটিয়ে ছাড়বেন না। তেমন উৎপাত আরম্ভ হলে বাড়িতে পুলিশ রাখবার বন্দোবস্ত করব। এখানকার ইন্‌সপেক্টর সমাদ্দারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট খাতির আছে।

www.BDeBooks.Com

১৫ই সেপ্টেম্বর

খোকার বিচিত্র কাহিনীর যে এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটবে তা ভাবতেই পারিনি। গত দু'দিন এক মুহূর্ত ডায়রি লেখার ফুরসত পাইনি। কী ঝক্কি যে গেছে আমার উপর দিয়ে সেটা একমাত্র আমিই জানি। কারণটা অবিশ্যি যা ভয় পেয়েছিলাম তাই-ই। সেদিন অবিনাশবাবু আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে ফেরার আগে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে খোকার কীর্তির বর্ণনা দেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকে লোকজন উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে। খোকাকে আমি তার দোতলার ঘরেই রেখেছিলাম, এবং সে ঘুমোচ্ছে এই বলে লোক তাড়ানোর মতলব করেছিলাম। কিন্তু সারাক্ষণই ঘুমোচ্ছে এ কথাটা তো লোকে বিশ্বাস করবে না। রাত আটটা নাগাদ যখন আমার নীচের বৈঠকখানায় রীতিমতো ভিড় জমে গেছে, আর লোকেরা শাসাচ্ছে যে খোকাকে না দেখে সেখান থেকে তারা নড়বে না, তখন বাধ্য হয়েই খোকাকে নিয়ে আসতে হল। আর অমনি সকলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কী। আমি যথাসম্ভব দৃঢ়ভাবে বললাম, 'দেখুন—মাত্র সাড়ে চার বছরের ছেলে—আপনারা যদি এভাবে ভিড় করেন তা হলে তো আলোবাতাস বন্ধ হয়ে এমনিতেই তার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

তখন তারা বলল, 'তা হলে ওকে বাইরে আপনার বাগানে নিয়ে আসুন না।'

শেষ পর্যন্ত তাই হল। খোকাও বাগানে আসেনি কখনও—এসেই তার মুখে কথা ফুটল। সে ঘাস থেকে আরম্ভ করে যত ফুল ফল গাছ পাতা ঝোপ ঝাড় বাগানে রয়েছে, তার প্রত্যেকটির ল্যাটিন নাম আউড়ে যেতে লাগল। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবার এখানকার মিশনারি ইস্কুলের হেডমাস্টার ফাদার গলওয়ে ছিলেন। তিনি আবার বটানিস্ট। খোকার জ্ঞানের বহর দেখে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে আমার বেতের চেয়ারে বসে পড়লেন।

এই তো গেল পরশুর কথা। কাল আমার বাড়িতে কত লোক এসেছিল সেটা খোকা নিজেই রাত্রে বিছানায় শোবার সময় বলল। তার কথায় জানলাম, লোকের হিসেব হচ্ছে—সবসুদ্ধ তিনশ' ছাপান্ন জন, তার মধ্যে তিন জন সাহেব, সাতজন উড়িয়া, পাঁচজন আসামি, একজন জাপানি, ছাপান্নজন বিহারি, দুজন মাদ্রাজি আর বাকি সব বাঙালি।

গতকাল সকালে কলকাতা থেকে তিনজন খবরের কাগজের রিপোর্টার এসে হাজির। তারা খোকার সঙ্গে কথা না বলে ছাড়বে না। খোকা কথা বলল ঠিকই, কিন্তু তাদের কোনও প্রশ্নের জবাব সে দিল না। কেবল তিনজনকে আলাদা করে, তাদের কাগজে কত ছাপার কালি খরচ হয়, ক' লাইন খবর তাতে থাকে আর কত সংখ্যা কাগজ ছাপা হয়—এই সমস্ত হিসেব তাদের দিয়ে দিল।

একজন রিপোর্টারের সঙ্গে একটি ফটোগ্রাফার এসেছিল, সে এক সময় ফ্ল্যাশ ক্যামেরা দিয়ে খোকার একটি ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা উঁচিয়ে দাঁড়াল। খোকা বলল, 'ফ্ল্যাশ না। চোখে লাগে।'

ফটোগ্রাফার একটু হেসে খোকা খোকা গলা করে বলল, 'একটা ছবি খোকাবাবু। দেখো না কেমন সুন্দর ছবি হবে তোমার।'

এই বলে তুলতে গিয়ে দেখে কিছুতেই আর ফ্ল্যাশ জ্বলে না—অথচ বাল্‌বটা ঠিকই পুড়ে যাচ্ছে। এই করে সাতখানা বাল্‌ব পুড়ল—কিন্তু ফ্ল্যাশ আর জ্বলল না।

বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন যিনি সমীরণ চৌধুরী বলে নিজের পরিচয় দিলেন। কলকাতা থেকে আসছেন। বললাম, 'কী প্রয়োজন আপনার?'

ভদ্রলোক বললেন, তিনি নাকি একজন ইম্প্রেসারিও। অর্থাৎ বড় বড় নাচিয়ে বাজিয়ে

গাইয়ে ম্যাজিশিয়ান ইত্যাদির শো-এর বন্দোবস্ত করে দেন। তাঁর ইচ্ছে খোকাকে তিনি কলকাতার নিউ এম্পায়ার স্টেজে উপস্থিত করবেন। খোকা সেখানে প্রশ্নের জবাব দিয়ে, মন থেকে অঙ্ক কষে, ল্যাটিন আউড়ে, গান গেয়ে লোককে অবাক করে দেবে! এ থেকে খোকার খ্যাতিও হবে, রোজগারও হবে। তেমন বুঝলে বিলেতে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করা যেতে পারে।

আমি বললাম, 'খোকার মা বাবার অনুমতি ছাড়া আমি এ ব্যাপারে মত দিতে পারি না! ওর বাবার ঠিকানা আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন।'

সন্ধ্যার দিকে পাঁচ ছশো লোকের সামনে বসে নানারকম আশ্চর্য কথা বলার পর খোকা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'মির ইস্ট মুয়েডা।'

আমার ভাষা অনেকগুলোই জানা আছে—জার্মানটা রীতিমতো সড়গড়। বুঝলাম খোকা জার্মানে বলছে—'আমি ক্লান্ত।'

আমি তৎক্ষণাৎ সমবেত লোকদের বললাম যে খোকা এখন ভেতরে যাবে, সে বিশ্রাম করতে চায়। লোকেরা হয়তো এ কথায় একটু গোলমাল করতে পারত, কিন্তু পুলিশ থাকায় ব্যাপারটা বেশ সহজেই ম্যানেজড্ হয়ে গেল।

খোকাকে আমার ঘরেই শোওয়ালাম।

প্রায় যখন বারোটা বাজে, তখন দেখে মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি হাতের বইটা রেখে বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। আমার মনটা ভাল ছিল না। আমি নিজে নির্জনতা ভালবাসি। গত দু-দিন ভিড়ের ঠেলায় আমারও ক্লান্ত লাগছিল, যদিও ক্লান্তি জিনিসটা আমার সহজে আসে না। চার দিন চার রাত্রি না ঘুমিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে, এবং কোনওবারই কাবু হইনি! আসলে কাল খোকার ক্লান্তির আভাস পেয়েই আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কী উপায় হবে এই আশ্চর্য খোকার? তার মা বাবার কাছে যদি তাকে ফেরত দিয়ে আসি, তা হলেই বা সে রেহাই পাবে কী করে? সেখানেও তো উৎপাত শুরু হবে। এর একটা ব্যবস্থা করব বলে তো আমি নিজেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। আর এমনও নয় যে অন্য কোনও একটা বড় ডাক্তারের পরামর্শ নিলেই একটা উপায় হয়। ব্রেনে কী কী জাতীয় গোলমাল হতে পারে না পারে সেই নিয়ে আগেই আমার অনেক পড়াশুনা ছিল। তা ছাড়া গত কদিনে আমি একমাত্র এই বিষয়টা নিয়েই এগারোখানা বই পড়ে ফেলেছি। কোনওখানেই খোকার যেটা হয়েছে সে জাতীয় ঘটনার কোনও উল্লেখ পাইনি। পৃথিবীর ইতিহাসে খোকার এ ঘটনা একেবারে অনন্য ও অভূতপূর্ব এ বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই!

এইসব ভাবতে ভাবতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই! ঘুমটা ভাঙল আচমকা একটা বাজ পড়ার শব্দে। উঠে দেখি ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জন। এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় পাশের বিছানার দিকে চেয়ে দেখি—খোকা নেই!

আমি ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। কী জানি কী মনে হল—আমার বালিশটা তুলে দেখি, তার তলা থেকে আমার চাবির গোছাটাও উধাও। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে এসে ল্যাবরেটরির দিকে গিয়ে দেখি—দরজা হাঁ করে খোলা, আর ভিতরে বাতি জ্বলছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে যা দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে এল।

খোকা আমার কাজের টেবিলের সামনে টুলের উপর বসে আছে। তার সামনে টেবিলের উপর সার করে সাজানো আমার বিষাক্ত, মারাত্মক অ্যাসিডের সব বোতল। বুনসেন

www.BDeBooks.Com

বার্নারটাও জ্বলছে, আর তার পাশেই ফ্লাস্কে কী যেন একটা তরল পদার্থ সবেমাত্র গরম করা হয়েছে। খোকার হাতে এখন টিয়্যানিয়াম ফস্‌ফেটের বোতল।

সেটা কাত করে তার থেকে কয়েক ফোঁটা অ্যাসিড সে ফ্লাস্কটার মধ্যে ঢেলে দিতেই তার থেকে ভক ভক করে হলদে রঙের ধোঁয়া বেরোল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে গেল একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে, যাতে আমার প্রায় চোখে জল এসে গেল।

এবার, আমি ঘরে ঢুকেছি বুঝতে পেরে খোকা আমার দিকে ফিরে চাইল।

'অ্যানাইহিলিন কোথায় ?' খোকা গর্জন করে উঠল।

অ্যানাইহিলিন ? খোকা আমার অ্যানাইহিলিন চাইছে ? তার মতো সাংঘাতিক অ্যাসিড তো আর নেই। ও অ্যাসিড দিয়ে খোকা করবে কী ? ওটা তো আমার আলমারির উপরের তাকে বন্ধ থাকে। কিন্তু যেসব জিনিস খোকা এতক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তাতেও প্রায় খানত্রিশেক হাতিকে অনায়াসে ঘায়েল করা চলে !

আবার আদেশ এল—'অ্যানাইহিলিন দাও। দরকার ! এক্ষুনি।'

আমি নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে খোকার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'খোকা, তুমি যে সব জিনিস্ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ, সেগুলো ভাল না। হাতে লাগলে হাত পুড়ে যাবে, ব্যথা পাবে। তুমি আমার সঙ্গে ওপরে ফিরে চলো, এসো।'

এই বলে হাতটা বাড়িয়ে ওর দিকে একটু এগিয়ে গেছি, এমন সময় খোকা হঠাৎ টিয়্যানিয়াম ফস্‌ফেটের বোতলটা হাতে নিয়ে এমনভাবে সেটাকে তুলে ধরল, যে আর এক পা যদি এগোই আমি তা হলেই যেন সে সেটা আমার দিকে ছুড়ে মারবে। আর তা হলেই—মৃত্যু না হলেও—আমি যে চিরকালের মতো পুড়ে পঙ্গু হয়ে যাব সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই।

খোকা অ্যাসিডের বোতলটা আমার দিকে তাগ করে দাঁতে দাঁত চেপে আবার বলল, 'অ্যানাইহিলিন দাও—ভাল চাও তো দাও।'

এ অবস্থা থেকে আর বেরোবার কোনও উপায় নেই দেখে—এবং এত অ্যাসিড হ্যান্ডল করেও খোকা জখম হয়নি দেখে একটা ভরসা পেয়ে আমি আলমারিটা খুলে একেবারে ওপরের তাকের পিছন থেকে অ্যানাইহিলিনের বোতলটা বার করে খোকার সামনে রেখে মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম যে অ্যাসিডের বোতলটা খুলে তার থেকে অত্যন্ত সাবধানে ঠিক তিন ফোঁটা অ্যাসিড খোকা তার সামনের ফ্লাস্কটায় ঢালল। তারপর আমি কিছু করতে পারবার আগেই অবাক হয়ে দেখলাম যে খোকা তার নিজের তৈরি সবুজ রঙের মিক্‌সচার ঢক ঢক করে চার ঢোকে গিলে ফেলল। আর পর মুহূর্তেই তার শরীরটা টেবিলের উপর কাত হয়ে এলিয়ে পড়ল।

আমি দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে একেবারে সোজা দোতলায় তার খাটে নিয়ে গিয়ে ফেললাম। তার নাড়ি আর বুক পরীক্ষা করে দেখলাম—কোনও গোলমাল নেই, ঠিক চলছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসও ঠিক চলছে, মুখের ভাবে কোনও পরিবর্তন নেই, বরং বেশ শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। অজ্ঞান যে হয়েছে, তাও মনে হল না। ভাবটা ঘুমের—গভীর ঘুমের।

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আমিও চুপ করে খোকার খাটের পাশে বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে বৃষ্টি থেমে মেঘ কেটে যেতে দেখলাম ভোর হয়ে গেছে। কাক চড়ুই ডাকতে শুরু করেছে।

ঠিক ছটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় খোকা একটু এপাশ ওপাশ করে চোখ মেলে চাইল।

তার চাহনিতে কেমন যেন একটা নতুন ভাব। একটুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে একটু কাঁদো কাঁদো ভাব করে খোকা বলল, 'মা কোথায় ? মা'র কাছে যাব।'

* * *

আধ ঘণ্টা হল খোকাকে ঝাঝায় তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। ঝাঝা যাবার পথে গাড়িতেই খোকার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। যখন চলে আসছি, তখন সে তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়িয়ে বলল, 'আমায় লজঞ্চুস এনে দেবে দাদু,

www.BDeBooks.Com

লজঞ্চুস ?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই দেব। কালই আবার গিরিডি থেকে এসে তোমায় লজঞ্চুস দিয়ে যাব।'

মনে মনে বললাম, খোকাবাবু, একদিন আগে হলেও তুমি আর লজঞ্চুস চাইতে না—তুমি চাইতে দাঁতভাঙা ল্যাটিন নাম-ওয়ালা কোনও এক বিচিত্র, বিজাতীয় বস্তু।

সন্দেশ। আষাঢ় ১৩৭৪

প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত

১০ই এপ্রিল

ভূতপ্রেত প্ল্যানচেট টেলিপ্যাথি ক্লেয়ারভয়েন্স—এ সবই যে একদিন না একদিন বিজ্ঞানের আওতায় এসে পড়বে, এ বিশ্বাস আমার অনেকদিন থেকেই আছে। বহুকাল ধরে বহু বিশ্বস্ত লোকের ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী সেই সব লোকের মুখ থেকেই শুনে এসেছি। ভূত জিনিসটাকে তাই কোনওদিন হেসে উড়িয়ে দিতে পারিনি।

আমার নিজের কখনও এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি। চিনে জাদুকরের কারসাজিতে সম্মোহিত বা হিপনোটাইজ্‌ড্‌ হয়েছি, অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করেছি, গেছোবাবার মন্ত্রবলে জানোয়ারের কঙ্কালে রক্ত মাংস প্রাণ ফিরে আসতে দেখেছি। কিন্তু যে মানুষ মরে ভূত হয়ে গেছে, সেই ভূতের সামনে কখনও পড়তে হয়নি আমাকে।

এই অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই বোধ হয় কিছুদিন থেকে ভূত দেখার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল, আর কেবলই ভাবছিলাম ভূতকে হাজির করার বৈজ্ঞানিক উপায় কী থাকতে পারে।

এখানে অবিশ্যি কেবল রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা যন্ত্রপাতিতে কাজ হতে পারে না। তার সঙ্গে চাই কন্‌সেনট্রেশন। রীতিমতো ধ্যানস্থ হওয়া চাই—কারণ যে কোনও ভূত হলে তো চলবে না। বিশেষ বিশেষ মৃত ব্যক্তির ভূতকে ইচ্ছামতো আমার ঘরে এনে হাজির করে, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করে, তারপর তাদের আবার পরলোকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হবে যদি তাদের একেবারে সশরীরে এনে ফেলা যায়, যার ফলে তাদের আমরা স্পর্শ করতে পারি। তাদের সঙ্গে হ্যান্ড-শেক করতে পারি। তবেই না বিজ্ঞানের কৃতিত্ব!

গত তিন মাস পরিশ্রম, গবেষণা ও কারিগরির পর আমার নিও-স্পেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্রটা তৈরি হয়েছে। এখানে 'স্পেক্‌ট্রো' কথাটা 'স্পেক্‌ট্রাম' থেকে আসছে না, আসছে 'স্পেক্টার' অর্থাৎ ভূত থেকে। 'নিও'—কারণ এমন যন্ত্র এর আগে আর কখনও তৈরি হয়নি।

যন্ত্রের বিশদ বিবরণ আমার খাতায় রয়েছে, তাই এ ডায়রিতে সেটা আর দিলাম না। মোটামুটি বলে রাখি—আমার মাথার মাপে একটি ধাতুর হেলমেট তৈরি করা হয়েছে। তার দুদিক থেকে দুটো বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে একটা কাচের পাত্রে আমার তৈরি একটা তরল

সলিউশনের মধ্যে চোবানো দুটো তামার পাতের সঙ্গে যোগ করা হয়। হঠাৎ দেখলে অ্যাসিড ব্যাটারির কথা মনে হতে পারে।

সলিউশনটা অবশ্য নানারকম বিশেষ মালমশলা মিশিয়ে তৈরি। তার মধ্যে প্রধান হল শ্মশান-সংলগ্ন চিতার ধোঁয়ায় পরিপুষ্ট কিছু গাছের শিকড়ের রস।

এই সলিউশন গ্যাসের আগুনে গরম করলে তা থেকে একটা সবুজ রঙের ধোঁয়া বের হবে, খুব আশ্চর্যভাবে পাত্রের ওপরেই প্রায় এক মানুষ জায়গা নিয়ে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে। ভূতের আবির্ভাব হওয়ার কথা সেই কুণ্ডলীর মধ্যেই।

আজ সকালে যন্ত্রটাকে প্রথম টেস্ট করলাম। ষোলো আনা সফল হয়েছি বলব না, এবং এই আংশিক সাফল্যের প্রধান কারণ হল আমার কনসেনট্রেশনে গলদ। ল্যাবরেটরিতে ঢোকার সময় দেখলাম বারান্দার কোণে আমার বেড়াল নিউটন এক থাবায় একটা আরশোলা মারল। ফলে হল কী—হেলমেট পরে বসে ভূতের কথা ভাবতে গিয়ে কেবলই সেই আরশোলার নিষ্প্রাণ দেহটার কথা মনে হতে লাগল।

সেই কারণেই বোধ হয় মিনিট পাঁচেক পরে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে বিরাট এক আরশোলা তার শুঁড়গুলো যেন আমার দিকে নির্দেশ করে নাড়াচাড়া করছে।

প্রায় এক মিনিট ছিল এই আরশোলার ভূত। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম আজ আর অন্য ভূত নামানোর চেষ্টা বৃথা।

কাল সকালে আরেকবার চেষ্টা করে দেখব। আজ সমস্ত দিনটা মনের ব্যায়াম অভ্যেস করতে হবে, যাতে কাল কনসেনট্রেশনে কোনও ত্রুটি না হয়।

১১ই এপ্রিল

অভাবনীয়।

আজ প্রায় সাড়ে তিন মিনিট ধরে আমার পরলোকগত বন্ধু ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক আর্চিবল্ড অ্যাক্‌রয়েডের সঙ্গে আলাপ হল। নরওয়েতে রহস্যজনকভাবে অ্যাক্‌রয়েডের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ পরে আমি জেনেছিলাম—এবং সেটা এর আগেই আমি ডায়রিতে লিখেছি। আজ সেই অ্যাক্‌রয়েড অতি আশ্চর্যভাবে আমার সবুজ ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আবির্ভূত হলেন।

আশ্চর্য বলছি এই জন্যে যে, অ্যাক্‌রয়েডের বিষয় প্রায় পাঁচ মিনিট ধ্যান করার পর যে জিনিসটা প্রথম দেখা গেল ধোঁয়ার মধ্যে সেটা হল একটি নরকঙ্কাল—যার ডান হাতটা আমার দিকে প্রসারিত।

তারপর হঠাৎ দেখি সে কঙ্কালের চোখে সোনার চশমা। এ যে অ্যাক্‌রয়েডেরই বাইফোকাল চশমা, সেটা আমি দেখেই চিনলাম।

চশমার পর দেখা গেল দাঁতের ফাঁকে একটা বাঁকানো পাইপ—অ্যাক্‌রয়েডের সাধের ব্র্যায়ার।

তারপর পাঁজরের ঠিক নীচেটায় একটা চেনওয়ালা ঘড়ি। এও আমার চেনা।

বুঝতে পারলাম অ্যাক্‌রয়েডের চেহারার যে বিশেষত্বগুলি আমার মনে দাগ কেটেছিল, সেগুলো আগে দেখা যাচ্ছে।

ঘড়ি, পাইপ ও চশমাসমেত কঙ্কাল হঠাৎ বলে উঠল—

'হ্যালো, শঙ্কু!'

এ যে স্পষ্ট অ্যাক্‌রয়েডের গলা!—আর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গেই স্যুটপরিহিত সৌম্যমূর্তি অ্যাক্‌রয়েডের সম্পূর্ণ অবয়ব ধোঁয়ার মধ্যে প্রতীয়মান হল। তাঁর ঠোঁটের কোণে সেই

www.BDeBooks.Com

ছেলেমানুষি হাসি, মাথার কাঁচাপাকা চুলের একগোছা কপালের ওপর এসে পড়েছে। গায়ে ম্যাকিনটশ, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা।

আমি প্রায় হাত বাড়িয়ে অ্যাক্‌রয়েডের হাতে হাত মেলাতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে অপ্রস্তুত হয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। করমর্দন সম্ভব ছিল না কারণ যা দেখেছিলাম তা অ্যাক্‌রয়েডের জড়রূপ নয়, শূন্যে ভাসমান প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য এই যে প্রেতচ্ছায়ার কণ্ঠস্বর অতি স্পষ্ট। আমি কিছু বলার আগেই অ্যাক্‌রয়েড তাঁর গম্ভীর অথচ মসৃণ গলায় বললেন,—

'তোমার কাজের দিকে আমার দৃষ্টি রয়েছে। যা করছ, তা সবই খেয়াল করি। তুমি তোমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করছ।'

উত্তেজনায় আমার গলা প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। তবু কোনওরকমে বললাম, 'আমার নিও-স্পেক্‌ট্রোস্কোপ সম্বন্ধে তোমার কী মত ?'

সবুজ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর থেকে মৃদু হেসে অ্যাক্‌রয়েড বললেন 'আমার দেখা যখন তুমি পেয়েছ, তখন আর মতামতের প্রয়োজন কী ? তুমি নিজেই জানো তুমি কৃতকার্য হয়েছ। যারা লোকান্তরিত, তারা মতামতের ঊর্ধ্বে। মানসিক প্রতিক্রিয়ার কোনও প্রয়োজন আমাদের জগতে নেই। চিন্তা ভাবনা সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সবই এখানে অবান্তর।'

আমি অবাক হয়ে অ্যাক্‌রয়েডের কথা শুনছি, আর এরপর কী জিজ্ঞেস করব ভাবছি, এমন সময় একটা অদ্ভুত হাসির সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্‌বুদের মতো অ্যাক্‌রয়েড অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর তারপরেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা আমার দিকে এগিয়ে এল—আর আমি বুঝতে পারলাম যে আমার চেতনা লোপ পেয়ে আসছে।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমার চাকর প্রহ্লাদ আমার কপালে জলের ছিটা দিচ্ছে।

'এই গরমে লোহার টুপি মাথায় পরে বসে আছ বাবু—বুড়ো বয়সে এত কি সয় ?'

হেলমেটটা খুলে ফেললাম ! বেশ ক্লান্ত লাগছে। বুঝলাম অতিরিক্ত কন্‌সেন্‌ট্রেশনের ফল। কিন্তু অ্যাক্‌রয়েডের প্রেতাত্মা যে আজ আমার ল্যাবরেটরিতে আবির্ভূত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে, তাতে কোনও ভুল নেই। আমার গবেষণা, আমার পরিশ্রম অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। আশ্চর্য আবিষ্কার আমার এই নিও-স্পেক্‌ট্রোস্কোপ !

মনে মনে ভাবলাম—সামান্য শারীরিক গ্লানিতে নিরুৎসাহ হলে চলবে না। কাল আবার বসব এই যন্ত্র নিয়ে। ইচ্ছা হচ্ছে বিগত যুগের কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রেতাত্মার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করে তাদের সঙ্গে কথা বলব।

১২ই এপ্রিল

অন্ধকূপ হত্যার আসল ব্যাপারটা জানবার জন্য আজ ভেবেছিলাম সিরাজদ্দৌলাকে একবার আনব—কিন্তু সব প্ল্যান মাটি করে দিলেন আমার প্রতিবেশী অবিনাশ চাটুজ্যে।

বৈঠকখানায় বসে সবেমাত্র কফি শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছছি, এমন সময় ভদ্রলোক হাজির।

অবিনাশবাবুর মতো অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। ভদ্রলোকের জন্ম হওয়া উচিত ছিল প্রস্তরযুগে। বিংশ শতাব্দীতে তিনি একেবারেই বেমানান। আমার সাফল্যে ঔদাসীন্য ও ব্যর্থতায় টিটকিরি—এ দুটো জিনিস ছাড়া ওঁর কাছে কখনও কিছু পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

ঘরে ঢুকেই আমার সামনের সোফায় ধপ করে বসে পড়ে বললেন, 'উশ্রীর ধারে

ঘোরাফেরা হচ্ছিল কী মতলবে ?'

উশ্রীর ধারে ? আমি মাঝে মাঝে অবিশ্যি প্রাতর্ভ্রমণে যাই ওদিকটা, কিন্তু গত বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যে যাইনি। সত্যি বলতে কী, বাড়ি থেকেই বেরোইনি। তাই বললাম—

'কবেকার কথা বলছেন ?'

'আজকে মশাই, আজকে। এই ঘণ্টাখানেক হবে ! ডাকলুম—সাড়াই দিলেন না।'

'সেকী—আমি তো বাড়ি থেকে বেরোইনি।'

অবিনাশবাবু এবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

'এ আবার কী ভিমরতি ধরল আপনার ! অস্বীকার করছেন কেন ? ওরকম করলে যে লোকে আরও বেশি সন্দেহ করবে। আপনার পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি হাইট, ওই টাক—ওই দাড়ি—গিরিডি শহরে এ আর কার আছে বলুন !'

আমি যুগপৎ রাগ আর বিস্ময়ে কিছু বলতে পারলাম না ! লোকটা কী ? আমি মিথ্যেবাদী ? আমি—ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু ? আমার কিছু মূল্যবান ফরমুলা আমি কোনও কোনও অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের কাছে গোপন করেছি বটে কিন্তু উশ্রীর ধারে যাবার মতো সামান্য ঘটনা আমি অবিনাশবাবুর মতো নগণ্য লোকের কাছে গোপন করতে যাব কেন ?

অবিনাশবাবু বললেন, 'শুধু আমি নয়। রামলোচন বাঁড়ুজ্যেও আপনাকে দেখেছেন, তবে সেটা উশ্রীর ধারে নয়—জজসাহেবের বাড়ির পেছনের আমবাগানে। আর সেটা আমার দেখার পরে। এইমাত্র শুনে আসছি। আপনি তাকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

আমি চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক শুধু নিজে মিথ্যে কথা বলছেন না, অন্য আরেকজন প্রবীণ ব্যক্তিকেও মিথ্যেবাদী বানাচ্ছেন। এর কী কারণ হতে পারে তা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমার চাকর প্রহ্লাদ অবিনাশবাবুর জন্য কফি নিয়ে এল। ভদ্রলোক ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'হ্যাঁ হে পেল্লাদ—বলি, তোমার বাবু আজ সারা সকাল বাড়িতেই ছিলেন, না বেরিয়েছিলেন।'

প্রহ্লাদ বলল, 'কাল অত রাত অবধি লাবুটেরিতে খুট্‌খাট্‌ কইল্লেন, আর আজ অমনি সক্কালে বেইরে যাইবেন ? বাবু বাড়িতেই ছিলেন।'

এখানে একটা কথা বলা দরকার—আমি কাল সকালের পর আদৌ আমার ল্যাবরেটরিতে যাইনি। বিনা কারণে আমি কখনও ল্যাবরেটরিতে যাই না। আমার সারাদিনের কাজ ছিল কন্‌সেন্‌ট্রেশন অভ্যাস করা—এবং সে কাজটা আমি করি আমার শোবার ঘরেই। রাত্রে নটার মধ্যে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—উঠেছি যথারীতি ভোর পাঁচটায়। অথচ প্রহ্লাদ বলে কিনা আমি ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছি ?

আমি প্রহ্লাদকে বললাম, 'আমি যখন কাজ করছিলাম, তখন তুমি আমাকে কফি দিয়েছিলে কি ?'

'হাঁ বাবু—দিয়েছিলাম যে ! তুমি অন্ধকার ঘরে খুটুর খুটুর করছিলে—আমি—'

আমি প্রহ্লাদকে বাধা দিয়ে বললাম, 'অন্ধকার ঘর ? তা হলে তুমি আমায় চিনলে কী করে ?'

প্রহ্লাদ একগাল হেসে বলল, 'তা আর চিনব না বাবু ! চাঁদের আলো ছিল যে। মাথা হেঁট করে বসেছিলে। মাথায় আলো পড়ে চকচক...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

অবিনাশবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'সেই যে কী এক বায়স্কোপ দেখেছিলাম—একই মানুষ দু' ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে—একই সময় এখানে ওখানে—আপনারও কি সেই দশা হল

www.BDeBooks.Com

নাকি ? তা কিছুই আশ্চর্য নয়। পই পই করে বলিছি ও সব গবেষণা ফবেষণার মধ্যে যাবেন না—ওতে ব্রেন অ্যাফেক্ট করে। গরিবের কথা বাসি হলে তবে ফলে কিনা!'

আরও আধঘণ্টা ছিলেন অবিনাশবাবু। বুঝতে পারছিলাম একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটানোর ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোক আমার দিকে আড় চোখে লক্ষ রাখছিলেন। আমি আর কোনও কথা বলতে পারিনি, কারণ আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জানি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল।

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে রামলোচনবাবুর বাড়ির দিকে গেলাম। ভদ্রলোক তাঁর গেটের বাইরে বাঁধানো রকটাতে বসে সুরেনডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমায় দেখে বললেন, 'আপনি একটা হিয়ারিং এড ব্যবহার করুন। এত ডাকলুম সকালে, সাড়াই দিলেন না। কী খুঁজছিলেন মিত্তিরের আমবাগানে ? কোনও আগাছাটাগাছা বুঝি ?'

আমি একটু বোকার মতো হেসে আমতা আমতা করে আমার অন্যমনস্কতার একটা কাল্পনিক কারণ দিলাম। তারপর বিদায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উশ্রীর ধারে গিয়ে বসলাম। সত্যিই কি আমার মতিভ্রম হয়েছে—মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছে ? এরকম ভুল তো এর আগে কখনও হয়নি। সাতাশ বছর হল গিরিডিতে আছি। নানারকম কঠিন, জটিল গবেষণায় তার অনেকটা সময় কেটেছে—কিন্তু তার ফলে কখনও আমার স্বাভাবিক আচরণের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেছে—এরকম কথা তো কাউকে কোনওদিন বলতে শুনিনি। হঠাৎ আজ এ কী হল ?

রাত্রে খাবার পর একবার ল্যাবরেটরিতে না গিয়ে পারলাম না।

নিও-স্পেক্‌ট্রোস্কোপটাকে যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তেমনই আছে। জিনিসপত্র বইখাতা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি কোনওটা এতটুকু এদিক ওদিক হয়নি !

এই ল্যাবরেটরিতে কি এসেছিলাম কাল রাত্রে ? আর এসেছি অথচ টের পাইনি ? অসম্ভব !

ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলাম। দক্ষিণের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো টেবিলের ওপর এসে পড়ল। মনে গভীর উদ্বেগ নিয়ে আমি জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম।

জানালা দিয়ে আমার বাগান দেখা যাচ্ছে। এই বাগানে রোজ বিকালে রঙিন ছাতার তলায় আমার প্রিয় ডেকচেয়ারে আমি বসে থাকি।

ছাতা এখনও রয়েছে। তার তলায় চেয়ারও। সে চেয়ার খালি থাকার কথা—কিন্তু দেখলাম তাতে কে জানি বসে রয়েছে।

আমার বাড়িতে আমি, প্রহ্লাদ ও আমার বেড়াল নিউটন ছাড়া আর কেউ থাকে না। মাথা খারাপ না হলে প্রহ্লাদ কখনও ও চেয়ারে বসবে না।

যে বসে আছে সে বৃদ্ধ। তার মাথায় টাক, কানের দু পাশে সামান্য পাকা চুল, গোঁফ ও দাড়ি অপরিচ্ছন্ন ভাবে ছাঁটা। যদিও সে আমার দিকে পাশ করে বসে আছে এবং আমার দিকে ফিরে চাইছে না তাও বেশ বুঝতে পারলাম যে তার চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার আশ্চর্য মিল।

এরকম অভিজ্ঞতা আর কারুর কখনও হয়েছে কি না জানি না। যমজ ভাইয়ের মধ্যে নিজের প্রতিরূপ দেখতে মানুষ অভ্যস্ত, কিন্তু আমার—যমজ কেন—কোনও ভাইই নেই। খুড়তুতো ভাই একটি আছেন—তিনি থাকেন বেরিলিতে—এবং তিনি লম্বায় ছ ফুট দু ইঞ্চি। এ লোক তবে কে ?

হঠাৎ মনে হল—শহরের কোনও ছেলেছোকরা আমার ছদ্মবেশ নিয়ে আমার সঙ্গে মস্‌করা করছে না তো ?